প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৩ ❖ ১৭ - ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সুসম্পর্কে বাংলাদেশ

শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন ও বাংলাদেশ

মা মারীয়ার জীবনে শোক

প্রয়াত শেফালী মার্গারেট ডি'কস্তা

জন্ম: ২৩ নভেম্বর, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ৮ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

দড়িপাড়া (সাহেব বাড়ী)

"সংসারের মায়া ছেড়ে আজিকে গেল যে জন
দাও প্রভু দাও তারে অনন্ত জীবন।"

আমাদের প্রাণপ্রিয় স্নেহময়ী মা দীর্ঘ দুই বছর জটিল কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার BRB হাসপাতালে গত ৮ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে দুপুর ১:৩০ মিনিটে আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তার দীর্ঘ অসুস্থকালীন সময়ে যারা আমাদের মায়ের পাশে থেকে প্রার্থনা ও সান্ত্বনা দিয়ে এবং শেষকৃত অনুষ্ঠান পর্যন্ত আমাদের মায়ের পাশে থেকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন সবাইকে জানাই ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আজ বহুদিন পর সবার মাঝেও যেন একাকীত্ব অনুভব হচ্ছে। মনের আকাশটা কেমন যেন মেঘলা হয়ে উঠেছে।

"আমার সে স্নেহময়ী হারানো মাকে নিয়ে।
প্রজন্মের অন্তরালে কোথায় হারিয়ে গেলে
আমার সে স্নেহময়ী মা।

'মা' কোথায় গেলে পাবো তোমার সেই হাস্যময়ী মুখ, কোথায় পাবো তোমার সেই আদরের ছোয়া? বলে দাও মা সেই ঠিকানা। মা তোমাকে যে আমাদের সারাজীবন দরকার ছিলো। তোমার কথা মনে পড়লেই আজও বুকের ভিতর কেমন করে। তোমার আদর্শ, সততা, নৈতিকতা আজ আমাদের মধ্যে বিরাজ করে। মা জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানোর ও বর্ণনা করার মত শব্দ ও বুদ্ধি আমার কাছে নেই। সে আমাদের জীবন-এর কথা মনে করে নিজের জীবন সম্পর্কে ভুলে যায়। মা তুমি আমাদের প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করো যেন আমরা তোমার শিখানো আদর্শ, সততা ও নৈতিকতাকে কাজে লাগিয়ে সামনে আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি দয়ালু ঈশ্বর যেন তোমাকে অনন্ত বিশ্রাম দান করেন।

তোমার অতি আদরের-

ছেলে: আশীষ ও উজ্জল ডি'কস্তা
ছেলে বউ: রত্না ও শ্যামলী ডি'কস্তা
নাতনী: রেসেল, ষ্টেলা, অলিভিয়া ও স্ট্যাফি
নাতী: ষ্টীফ

বিজ্ঞ/২৮৫/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ৩৩
১৭ - ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২ - ৮ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সুসম্পর্কে বাংলাদেশ

সুসম্পর্কে থাকা ও রাখা প্রায় সকলেরই কাছে কাঙ্খিত। ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিবেশি যেমনি নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রত্যাশা করে তেমনি জাতি, গোষ্ঠি ও রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রত্যাশা করে। কেননা সকলেই উপলব্ধি করে, সুসম্পর্ক একটি অদৃশ্য দৃঢ় শক্তি ও বন্ধন যা সকল পক্ষকেই শান্তি-স্বস্তি দান করার সাথে সাথে সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতেও সহায়কের ভূমিকা পালন করে। সুসম্পর্কের আদর্শ ও উৎস খ্রিস্টবিশ্বাসীরা খুঁজে পেতে পারে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মধ্যে। যারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরও মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে চেয়েছেন বলেই মানুষকে আপন প্রতিমূর্তিতে নর ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে মানুষ ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। জীবন চলার পথে মানুষ আপন পথ ও মত অনুযায়ী চলে সম্পর্ক হানি করে। কিন্তু দয়াশীল ঈশ্বর তাঁর উদারতায় ক্ষমা ও মার্জনা করে মানুষকে আবার সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ দিয়েছে বিভিন্ন প্রবক্তা ও তাঁর পুত্র যিশুর মাধ্যমে। যিশুর দেওয়া জীবন-বাণী ও দেহ-রক্ত গ্রহণ করার মধ্যদিয়েই আমরা তাঁর সাথে সংযুক্ত হই ও সম্পর্ক গড়ে তুলি। যিশুর প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর পরিচালিত বিভিন্ন সংস্কারীয় সেবাকাজে উপযুক্তভাবে সাড়া দিয়ে এবং দয়ার সেবাকাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আমরা যিশু ও প্রতিবেশি মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। যে ব্যক্তি যত বেশি ভালো সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে সে ব্যক্তি তত বেশি সুখী মানুষ হয়ে ওঠতে পারবে। সম্পর্ক ব্যতীত পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কোন ক্ষেত্রেই অগ্রগতি, উন্নতি ও সাফল্য সম্ভব নয়।

সম্পর্কের শক্তি যথার্থভাবে অনুধাবন করেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' নির্ধারণ করেছিলেন। এ যে কত দূরদর্শি সিদ্ধান্ত ছিল তা পরবর্তীতে সকলেই অনুধাবন করতে পেরেছে। জাতির জনকের নেতৃত্ব ও উদার পররাষ্ট্রনীতির কারণে মাত্র সাড়ে তিন বছরে ১২৬টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করে বাংলাদেশ। ক্ষুধা-দারিদ্র, দুর্যোগ-দুর্ভোগে নিমজ্জিত এই বাংলাদেশ বিশ্বের সকল দেশের সাথেই সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী এবং সময়ের সাথে সাথে পারদর্শী হয়ে ওঠছে। এক সময়ের গ্রহীতার দেশ এখন কিছু কিছু দান করতেও এগিয়ে আসছে। শান্তি সুরক্ষা ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং শান্তির সংস্কৃতি বিনির্মাণে বাংলাদেশ থেকে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করার মধ্যদিয়ে নিয়মিত অবদান রেখে চলেছে।

বর্তমান সময়ে সুসম্পর্ক রচনায় বাংলাদেশ এক প্রত্যয় ও অনুপ্রেরণার নাম। আঞ্চলিক বহুপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে ও রাষ্ট্রসমূহে উদীয়মান প্রতিযোগিতামূলক বিভাজনের ঝুঁকি কমাতে বাংলাদেশ তার প্রতিবেশি এবং বিশ্বের পরাশক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক অব্যাহত রাখছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের প্রতিবেশির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু বাংলাদেশের চিহ্নিত কোন শত্রু নেই। বিভিন্ন সময়ের বিশেষভাবে বর্তমানের সরকার আলোচনার মাধ্যমে সকল দ্বি-পাক্ষিক বিষয় সমাধানে বিশ্বাসী। প্রতিবেশি দেশের সাথে স্থল, সমুদ্রসীমা ও গঙ্গার পানি বন্টন বিষয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। একসময়ের তলাবিহীন ঝুড়ি আজ বিশ্বকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করছে তাদের সাথে সম্পর্কে জড়াতে।

এ বছরের জানুয়ারি থেকে এ মাস পর্যন্ত অনবরত বেশ কিছু দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিভিন্ন পর্যায়ের মন্ত্রী, জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকর্তা, রাণী মাথিল্ডা, সেনাবাহিনী প্রধান, উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফর করে বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, ব্যবসায়িক, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ তার 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' এই নীতি অবলম্বন করে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি বজায় রেখে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক লালন করছে। এ ভারসাম্যপূর্ণ নীতি বজায় রেখে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ অন্যদেশগুলোর সাথে আরো সম্পর্ক বৃদ্ধি করুক সে প্রত্যাশা করছি। তবে বৈদেশিক সুসম্পর্কের সাথে সাথে নিজের দেশের মানুষের মধ্যে যেন আরো সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পায় সেলক্ষ্যে সকলেরই সচেতন হওয়া ও যত্নশীল আচরণ করা বাঞ্চনীয়। †

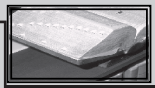

আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলাম, তেমনি তোমার সহকর্মীর প্রতি দয়া দেখানো কি তোমারও উচিত ছিল না? - মথি ১৮:৩৩

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

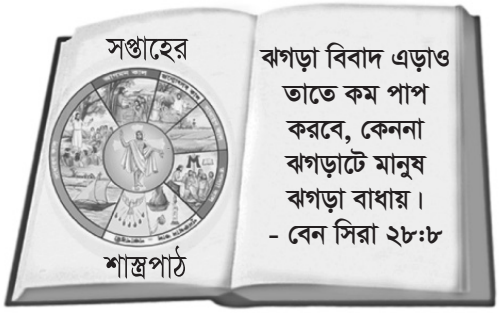

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৭ - ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার
সিরা ২৭: ৩৩ -- ২৮: ৯, সাম ১০২: ১-৪, ৯-১২, রোম ১৪: ৭-৯, মথি ১৮: ২১-৩৫

১৮ সেপ্টেম্বর, সোমবার
১ তিম ২: ১-৮, সাম ২৮: ২, ৭-৯, লুক ৭: ১-১০

১৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
সাধু জানুয়ারিউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর
১ তিম ৩: ১-৩, সাম ১০০: ১-৩, ৫, ৬, লুক ৭: ১১-১৭

২০ সেপ্টেম্বর, বুধবার
১ তিম ৩: ১৪-১৬, সাম ১১০: ১-৬, লুক ৭: ৩১-৩৫

২১ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধু মথি, প্রেরিতদূত ও সুসামাচার রচয়িতা, *পর্ব*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
এফে ৪: ১-৭, ১১-১৩, সাম ১৯: ১-৪, মথি ৯: ৯-১৩

২২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
১ তিম ৬: ২-১২, সাম ৪৯: ৫-৯, ১৬-১৯, লুক ৮: ১-৩

২৩ সেপ্টেম্বর, শনিবার
পিয়েত্রেল্‌চিনা'র সাধু পিউস (পাদ্রে পিও), যাজক, *স্মরণদিবস*
১ তিম ৬: ১৩-১৬, সাম ১০০: ১-৫, লুক ৮: ৪-১৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৮ সেপ্টেম্বর, সোমবার
+ ২০১০ ফাদার শিমন তিগ্‌গা (দিনাজপুর)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী বার্ণাডেট পিসিপিএ

১৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৪ সিস্টার মেরী লরেটো এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ফাদার আলফন্স কোড়াইয়া (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফাদার লুইজি মারকাতো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৬ সিস্টার শিউলী গমেজ এসসি (ঢাকা)
+ ২০১৮ সিস্টার ক্যাথেরিন গনসালভেস এসসি (খুলনা)

২০ সেপ্টেম্বর, বুধবার
+ ১৯৭৯ সিস্টার মেরী আন্তনী পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯১ সিস্টার এম. লরেন্সিয়া আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৫ সিস্টার আন্দ্রিনা ব্যাপারী এসসি (যশোর)
+ ২০১৬ সিস্টার রোজারিয়া গ্রিত্তি এসসি (ময়মনসিংহ)

২১ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৪ সিস্টার কর্ডুলা আরএনডিএম (ঢাকা)

২২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৪৮ সিস্টার এম. ব্লঞ্চ রিয়ার্ডন সিএসসি
+ ১৯৮১ ফাদার ভিন্সেন্ট ডেলাভি সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৬ সিস্টার রেবেকা গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২৩ সেপ্টেম্বর, শনিবার
+ ১৯২৩ ফাদার পাওলো রিপামন্তি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৫৫ ফাদার জন বাপ্তিষ্ট পিনসন সিএসসি
+ ১৯৬৬ ব্রাদার লুদোভিক ভালোয়া সিএসসি

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

১৫৯১: সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলী হল যাজকীয় সমাজ। দীক্ষাস্নান সকল বিশ্বাসীভক্তকে খ্রীষ্টের যাজকত্বের অংশীদার করে। এই অংশগ্রহণকে বলা হয় "বিশ্বাসীদের সাধারণ যাজকত্ব"। এই সাধারণ যাজকত্বকে ভিত্তি করে এবং এর সেবার উদ্দেশে খ্রীষ্টের মিশনদায়িত্বে আরেকটি অংশগ্রহণ রয়েছে: পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কারের দ্বারা প্রদত্ত সেবাকর্ম যেখানে, খ্রীষ্ট যিনি মস্তক, তাঁর নামে ও তাঁতেই সমাজের মধ্যে সেবা করা ।

১৫৯২: সেবাকারী যাজকত্ব সাধারণ যাজকত্ব থেকে স্বরূপগতভাবে পৃথক, কারণ বিশ্বাসীগণের সেবার উদ্দেশে এই সেবাকারী যাজকত্ব পুণ্য ক্ষমতা প্রদান করে। অভিষিক্ত সেবাকর্মী ঐশজনগণের সেবা করেন শিক্ষাদানে (munus docendi), পুণ্য উপাসনায় (munus liturgicum) ও পালকীয় প্রশাসনে (manus regendi)।

১৫৯৩: আরম্ভ থেকেই অভিষিক্ত সেবাকর্ম তিনটি পদ-বিন্যাসে প্রদান করা হয়েছে ও কাজ সম্পাদিত হয়ে আসছে: বিশপ-পদ, যাজক-পদ ও ডিকন-পদ। পদাভিষেকের দ্বারা প্রদত্ত সেবাকর্ম খ্রীষ্টমণ্ডলীর সাংগঠনিক কাঠামোর জন্য অপরিহার্য: বিশপ, যাজক ও ডিকন ছাড়া, মণ্ডলীর কথা চিন্তা করা যায় না (দ্র: আন্তিয়োখের সাধু ইগ্নাসিউস, Ad Trall. 3.1) ।

১৫৯৪: বিশপ পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কারের পূর্ণতা লাভ করেন, যা তাকে বিশপ-সংঘে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তার উপর ন্যস্ত নির্দিষ্ট মণ্ডলীর দৃশ্যমান মস্তক করে তোলে। প্রেরিতদূতদের উত্তরাধিকারী ও বিশপ-সংঘের সদস্যরূপে বিশপগণ, সাধু পিতরের উত্তরাধিকারী, পোপ মহোদয়ের কর্তৃত্বাধীনে থেকে সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রৈরিতিক দায়িত্বে ও মিশনকর্মে অংশগ্রহণ করেন ।

১৫৯৫: যাজকগণ যাজকীয় মর্যাদায় বিশপদের সঙ্গে একাত্ম এবং একই সময়ে তাদের পালকীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য বিশপদের উপর নির্ভর করেন; তারা বিশপের বিচক্ষণ সহকর্মী হওয়ার জন্য আহূত। বিশপকে ঘিরে তারা যাজক-সংঘ গড়ে তোলেন যে-সংঘ বিশপের সঙ্গে নির্দিষ্ট মণ্ডলীর দায়িত্ব বহন করে। বিশপের কাছ থেকে তারা ধর্মপল্লীস্থ সমাজের কিংবা নির্দিষ্ট মাণ্ডলিক কাজের দায়িত্ব পান।

১৫৯৬: ডিকনগণ মণ্ডলীর সেবাকাজের জন্য অভিষিক্ত সেবাকর্মী: তারা সেবাকারীর যাজকত্ব লাভ করেন না। কিন্তু অভিষেক তাদেরকে ঐশবাণীর সেবাকর্ম, ঐশ-উপাসনা, পালকীয় প্রশাসন ও দয়ামূলক সেবাকাজ, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করে। এসবই তারা তাদের বিশপের পালকীয় কর্তৃত্বাধীনে সম্পাদন করেন।

১৫৯৭: পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কার দেওয়া হয় হস্ত-স্থাপনের মাধ্যমে, যার পরে রয়েছে আনুষ্ঠানিক অভিষেক- প্রার্থনা যার দ্বারা ঈশ্বরের কাছে অভিষেক প্রার্থীর জন্য সেবাকর্মের উদ্দেশে প্রয়োজনীয় পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ যাচ্‌না করা হয়। অভিষেক একটি সংস্কারীয় অক্ষয় মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করে ।

১৫৯৮: খ্রীষ্টমণ্ডলী পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কার শুধুমাত্র সেই দীক্ষাস্নাত পুরুষ ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, সেবাকর্মে যার যোগ্যতা যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়েছে। খ্রীষ্টমণ্ডলীর কর্তৃপক্ষেরই একমাত্র অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে কাউকে এই সংস্কার গ্রহণের জন্য আহ্বান করা।

১৫৯৯: লাতিন মণ্ডলীতে যাজকত্বের পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কার সেই সব প্রার্থীকেই দেওয়া হয় যারা সেচ্ছায় কৌমার্যজীবন গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং ঐশরাজ্যের ভালোবাসা ও মানুষের সেবার কারণে অবিবাহিত থাকার বাসনা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে প্রস্তুত।

১৬০০: বিশপগণই মাত্র তিনটি শ্রেণীর পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কার প্রদান করেন।

জীবন সাধনায় খ্রিস্টের ক্রুশ ও ক্রুশীয় মাহাত্ম্য

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

প্রভু যিশুখ্রিস্ট সমগ্র মানব জাতির মুক্তিদাতা। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়ে তিনি মানুষকে নবজীবন দিয়েছেন; দেখিয়েছেন শাশ্বত রাজ্যের পথ। আজ সেই পবিত্র ক্রুশই হল ভালোবাসার উৎস, যে ভালোবাসা আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র। আমাদের পাপের জন্য যিশুখ্রিস্ট নিজেকে উৎসর্গ করলেন ক্রুশের উপর। ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ তিনি আমাদের দেখিয়েছেন ক্রুশীয় মৃত্যুবরণের মধ্যদিয়ে, যাতে আমরা তাঁর ভালোবাসা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের পাপ ও মন্দতা থেকে মুক্ত করার জন্য এবং জীবনের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি ক্রুশের উপর প্রাণ বির্সজন দিয়ে ঐশ ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন যেন আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। আমরা যখন পবিত্র ক্রুশের দিকে তাকাই তখন আমাদের চোখের সামনে প্রভু যিশুর ক্রুশীয় যাতনা ও কষ্টের কথা স্মরণে আসে। প্রভু যিশুর ক্রুশীয় কষ্ট ও যাতনার মধ্যদিয়ে পিতা ঈশ্বরের ভালোবাসাও প্রকাশ পায়। আর এই ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে পিতা ঈশ্বর এই পৃথিবীর মানুষকে আপন করে নিয়ে স্বর্গ ও মর্তের যোগাযোগ স্থাপন করেছেন।

সৃষ্টির ইতিহাসে দেখতে পাই, আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করলে ঈশ্বর তাদের এদেন বাগান থেকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। এভাবে দিনের পর দিন মানুষ পাপ করতে করতে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এই অবস্থায় ঈশ্বর মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবক্তাদের প্রেরণ করেছেন। অবশেষে তিনি কুমারী মারীয়ার মধ্যস্থতায় নিজ পুত্র যিশুকে এই পৃথিবীতে পাঠালেন যেন মানুষ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। যিশুখ্রিস্ট মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন যাতে মানুষ ঈশ্বরের আরও কাছে আসতে ও তাঁর সান্নিধ্যে বাস করতে পারে। এজন্য যিশু সমাজের পাপীতাপী, ঘৃণিত, নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত মানুষের পক্ষ নেওয়ার জন্য নিষ্পাপ হয়েও মানুষের পাপ মোচনের জন্য দীক্ষাস্নান গ্রহণ করলেন। তিনি শুধুমাত্র দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে থেমে থাকেন নি, বরং মানুষের পাপের জন্য ঘৃণা ও অপমানজনক ক্রুশের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে তিনি ক্রুশকে পবিত্র করে তুললেন এবং মানুষের পাপের বলি হিসেবে নিজেকেই সেই ক্রুশে বলিকৃত করলেন। এভাবে হয়ে উঠলেন পাপীর পরিত্রাতা এবং ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ এবং স্বর্গ ও মর্তের সংযোগকারী।

প্রভু যিশু ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মানুষের জীবনে নতুন আশা ও নবজীবন এনেছেন। এজন্য যিশুর পবিত্র ক্রুশ নতুন জীবনের প্রতীক। কেননা এই ক্রুশ প্রত্যেক খ্রিস্ট বিশ্বাসীর জীবনে আশা ও নতুন জীবনের প্রতীক। কারণ যিশু ক্রুশে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে জাগতিক মোহ-মায়া, লোভ-লালসা ও পাপের দিক থেকে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করেন। কেননা একমাত্র প্রভু যিশুর ক্রুশই আমাদের সকল প্রকার জাগতিক মোহমায়া ও ভোগবিলাসিতা থেকে মুক্ত ক'রে নতুন জীবনের আশা ও আলো দেখাতে পারে। কথায় আছে 'ভোগে নয় ত্যাগেই সুখ'। কাজেই আমরা কষ্টের মাধ্যমে যে আনন্দ বা কোন কাজে সফলতা পেলে তা জীবনকে আরও সমৃদ্ধশালী করে। কষ্টার্জিত সাফল্য বেশি দিন টিকে থাকে আর কষ্টবিহীন সাফল্য পেলেও সেটা বেশিদিন স্থায়ী হয় না; প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না। যিশু বলেছেন, 'আমাদের নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে। আমাদের জীবনের সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা আমাদের নিজেদেরই বহণ করতে হবে। আর তাতেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব আমাদের জীবনের প্রকৃত আনন্দ। আমাদের মানব জীবনে কষ্টের কোন পরিসীমা নেই; যার দরুণ একটি কষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই আরেকটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেই কষ্টকে জীবনেরই একটি অংশ হিসেবে মেনে নিতে পারলেই আমরা আমাদের ক্রুশ বহণ করে যিশুর দিকে যেতে পারব। আমরা চাই বা না চাই আমাদের জীবনে ক্রুশ আসবেই। প্রভু যিশুর পবিত্র ক্রুশ হল আমাদের সকল সান্ত্বনার উৎস।

প্রভু যিশুর ক্রুশের মাহাত্ম আমাদের আহ্বান করে আমরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসি। এই ভালোবাসা যেন শুধুই আমাদের আপনজনদের প্রতি না হয়। বরং এই ভালোবাসা হতে হবে সর্বজনীন অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য। এমনকি খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের শত্রুদেরও ভালোবাসতে হবে। যিশু বলেছেন আমার আদেশ হল এই "আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও পরস্পরকে তেমনই ভালোবাসবে" *(যোহন ১৫:১২)*। ভালোবাসা যতনা কঠিন তার চেয়ে আরও কঠিন ভালোবাসার মানুষ হতে পারা। প্রভু যিশুর ভালোবাসা কোন আবেগিক ব্যাপার নয়। হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা থাকলে মানুষের বাহিরের রূপটাও ভালোবাসাময় হয়ে ওঠে। আর প্রকৃত ভালোবাসার কোন শর্ত বা লাভ-লোকসানের হিসেব থাকে না। বরং সেখানে থাকে সেবা, শান্তি ও আনন্দ। এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, "তোমরা যদি পরস্পরকে ভালবাস; তবেই সকলে জানবে তোমরা আমারই শিষ্য" *(যোহন ১৩:৩৫)*।

ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করার মধ্য দিয়ে প্রভু যিশু ক্ষমার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যিশু বলেছিলেন, "পিতা, ওদের ক্ষমা কর! কারণ ওরা যে কী করছে, ওরা তা জানে না" *(লুক ২৩:৩৪)*! তিনি আমাদেরকে এতই ভালোবাসলেন যে, তার প্রমাণ তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন এই ক্ষমার মধ্যদিয়ে। আমরাও যেন সেই ক্ষমা করার গুণটি অর্জন করতে পারি প্রভু যিশু আমাদের সেই আহ্বান করছেন। ক্রুশের উপরে খোলা দু'বাহু যেন ভালোবাসার আহ্বান। যিশু ক্রুশের উপরে উঠেছেন যেন সকল মানুষকে তাঁর কাছে টেনে নিতে পারেন। ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেই প্রভু যিশু নিজ রক্তমূল্যে সকল মানুষের পাপ নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন, গৌরবান্বিত হয়েছেন ও আমাদের সবাইকে ক্রুশের দিকে টেনে এনেছেন।

প্রভু যিশুখ্রিস্টের ক্রুশ ও ক্রুশমৃত্যু একটি রহস্যময় ঘটনা। এই ঘটনার মধ্যদিয়ে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার চরম পর্যায়, অন্যদিকে প্রকাশিত হয়েছে খ্রিস্টের পরম ভালোবাসা ও ক্ষমা। যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু এবং বিজয় মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ। প্রভু যিশুর জীবনে যদি ক্রুশ না থাকত তবে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হতেন না, ক্রুশ না থাকলে প্রবাহিত হতনা শাশ্বত জীবনধারা, নিঃসৃত হতোনা খ্রিস্টের কুক্ষিদেশ থেকে রক্ত ও জল যা জগতকে করেছে পরিশুদ্ধ-নির্মল। ক্রুশ না থাকলে আমাদের পাপ অপরাধের তালিকাও বাতিল হত না, আমরা পেতাম না পরিত্রাণ, পারতাম না অন্যকে ভালোবাসতে ও ক্ষমা করতে। সর্বোপরি, আমাদের জন্য বন্ধ থাকতো স্বর্গদ্বার। যিশুর পবিত্র ক্রুশ কত মহান! ক্রুশ খ্রিস্টের বিজয়মুকুট ও সিংহাসন। সেই ক্রুশেই আমাদের পরিত্রাণ, নবজীবন এবং ক্ষমা ও ভালোবাসার চেতনা। সেই ক্রুশের ফলেই এসেছে পুনরুত্থান। প্রভু যিশুর ক্রুশের চিহ্ন দিয়েই আমাদের জীবনের শুরু, ক্রুশের আদর্শেই জীবনের গতি এবং ক্রুশের চিহ্ন দিয়েই আমাদের সমাধি ও সমাপ্তি। এই ক্রুশই আমাদের পরিচয়; ক্রুশেই আমাদের জয়, আমাদের আশা ও আনন্দ॥

মা মারীয়ার জীবনে শোক

সনি রোজারিও

মানব পরিত্রাণদায়ী ঐশ পরিকল্পনায় মা মারীয়ার ভূমিকা ছিলো অনন্য। তিনি যিশুর জন্ম থেকে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত তাঁর পুত্রের পাশে ছায়ার মত ছিলেন। চোখের সামনে নিজের সন্তানকে যাতনাভোগ করে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছেন। ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে তিনি পুত্রের যন্ত্রণাভোগের সঙ্গী হয়েছেন। একজন মা হিসেবে সত্যিই তা মেনে নেয়া মহাযন্ত্রণার। চোখের সামনে সন্তানের মৃত্যু কত কষ্টের তা শুধু মা-ই উপলব্ধি করতে পারেন। মারীয়া সব কিছু নীরবে সহ্য করেছেন। মা মারীয়ার সর্বোচ্চ কষ্ট হয়েছে কালভারীতে। যখন তিনি তাঁর পুত্রের এমন অবস্থা দেখেন, তখন তাঁর প্রাণ খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হল। মুক্তিদাতার জননী তিনি, মুক্তিদাতাকে মানুষ যত আঘাত হানবে, সেই আঘাত তাঁর জননীর বুকেও বাজবে (*লুক ২:৩৫*)। যখন সৈন্যরা যিশুর কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করেছিলো তখন মায়ের হৃদয়ও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলো। মা মারীয়া সকল আঘাত মেনে নিয়ে নীরবই রইলেন। তিনি তাঁর পুত্রের সাথে যাত্রা করেছেন, পুত্রের যাতনাভোগের সহযাত্রী হয়েছেন। শোকার্ত জননী হয়ে তিনি আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করছেন। আমরা যেন প্রত্যেকে তাঁর পুত্রের ঐশ রাজ্যে অনন্ত শান্তি লাভ করতে পারি।

মা মারীয়া দেহ, মন ও আত্মায় যিশুর সাথে থেকেছেন সেই কালভেরী পর্যন্ত। মা মারীয়ার জীবন আনন্দে পূর্ণ ছিলোনা। বরং দুঃখ, কষ্ট ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ ছিলো। তিনি পূর্ণ সময়ই যিশুর ক্রুশের কাছে ছিলেন, সেই কালভেরী পর্যন্ত। পুত্রের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছেন। যিশু তাঁর শিষ্যদের অনেক ভালোবেসেছেন। কিন্তু ক্রুশের নিচে মা মারীয়ার সাথে যোহন ও কয়েকজন স্ত্রীলোক ছাড়া আর কেউই ছিলোনা। মারীয়া নিজের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই সাথে তাঁর জীবনে আসা সমস্ত দুঃখ-কষ্টকেও গ্রহণ করেছিলেন। মারীয়া যিশুর কষ্ট সহ্য করে সাক্ষ্যমরগণের রাণী হয়ে উঠেছেন। শেষ ভোজ থেকে ওঠে যিশু ও তাঁর শিষ্যগণ কিদ্রোন-গিরিখাদের ওপারে গেলেন। সেখানে বাগানে অন্তর্বেদনায় তিনি গভীর ধ্যান প্রার্থনা করেন এবং সেখানে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সৈন্যদল যিশুকে ধরে বেঁধে প্রথমে আন্নার কাছে নিয়ে গেল। আন্না আবার যিশুকে পাঠিয়ে দিলেন মহাযাজক কাইফার কাছে। এরপর ইহুদীরা যিশুকে রোমীয় প্রদেশপাল পিলাতের প্রাসাদে নিয়ে গেল। পিলাত যিশুকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইহুদীদের জেদের কারণে পিলাত যিশুকে ক্রুশে দেবার জন্যে তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। এইসব ঘটনা যখন ঘটছে তখন মারীয়া কোথায় ছিলেন? মারীয়া যোহনের সঙ্গে থেকে সব কিছুর সাক্ষী হয়েছিলেন।

আমরা নিশ্চিত যে, মারীয়া কালভেরীতে যিশুর সাথে যাত্রা করেছিলেন। কারণ যোহনের মঙ্গলসমাচারে দেখি যিশুর ক্রুশের নিচে মারীয়া উপস্থিত ছিলেন। ঐতিহ্য অনুসারে কালভেরীর যাত্রা পথে মারীয়া ও যিশুর সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তবে যোহনের মঙ্গলসমাচারে দেখি মারীয়ার উপস্থিতি ক্রুশের নিচে। "এদিকে যিশুর মা, তাঁর মায়ের বোন, ক্লেপাসের স্ত্রী মারীয়া এবং মাগ্‌দালার মারীয়া তখন ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাকে এবং মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই শিষ্যকে দেখে, যাকে তিনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন, যিশু মাকে বললেন: "মা, ওই দেখ, তোমার ছেলে!" তারপর তিনি শিষ্যটিকে বললেন: "ওই দেখ, তোমার মা!" সেই সময় থেকে শিষ্যটি তাঁকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল (*যোহন ১৯:২৫-২৭*)।

যিশু ও মারীয়ার সাক্ষাতের অন্তরালে এমন কিছু প্রচ্ছন্ন বিষয় ছিলো, যা তাঁরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনি। যদিও সেই মুহূর্তে মারীয়া ও যিশু একে অপরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাঁরা তাদের জীবন দিয়ে মনের অবস্থা উপলব্ধি করেন। অনেক মা তার চোখের সামনে প্রিয় সন্তানের মৃত্যু দেখেন কষ্ট পান, কিন্তু মারীয়ার অভিজ্ঞতা ছিলো বিশেষ ধরনের। তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুযন্ত্রণা ও কষ্ট উপলব্ধি করেছেন কোন হাসপাতালে নয় বরং খোলা আকাশের নিচে, কোন আরামদায়ক বিছানায় নয় বরং ক্রুশের উপরে, সহানুভূতিশীল মানুষের মাঝে নয় বরং তাদের মাঝে যারা তাঁর বিরুদ্ধে চিৎকার করছিলো। ক্রুশ থেকে যিশুর মৃতদেহ নামানোর পর মারীয়া তাঁকে কোলে নিলেন। সন্তানের মৃতদেহ নিজের কোলে নিয়ে একজন নারীর শোক কতটা গভীর তা আমরা কল্পনা করতে পারি। এমন পরিস্থিতিতে কোন সান্ত্বনাই সেই নারীকে দমিয়ে রাখতে পারেনা। মা মারীয়ার অভিজ্ঞতা ঠিক এমনই ছিলো। তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে অসহায়ত্ববোধ করেননি বরং অসহায়ত্ববোধ করেছেন শিষ্যদের জন্য, যারা যিশুর শিষ্যত্বগ্রহণ করেছিলেন, যাদেরকে যিশু অনেক ভালোবেসেছিলেন, তারাই তাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। যিশুকে সমাধি দেবার পর, মারীয়া তাঁর একাকীত্বে, দূতের কাছে যে সম্মতি দিয়েছিলেন তা স্মরণ করেন। "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক!" (*লুক ১:৩৮*)। যিশু যে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করবেন মারীয়া কি বিশ্বাস করেছিলেন? অবশ্যই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল বি রোজারিও বলেন, যিশু যে পুনরুত্থান করবে, মারীয়া তা আগে থেকেই জানতেন। তাই তিনি রবিবার দিন ভোরে অন্য শিষ্যদের সাথে যিশুর কবরে যাননি।

শোকার্ত মারীয়ার জীবনে সাতটি ক্ষত সম্পর্কে আমরা জানতে পারি এবং তা নিয়ে ধ্যান করতে পারি। সেগুলো হলো:

ক. সিমিয়োনের ভবিষ্যৎ বাণী ছিলো মারীয়ার জীবনে প্রথম ক্ষত। যিশুর জন্মের আট দিন পর যোসেফ ও মারীয়া শিশু যিশুকে নিয়ে মন্দিরে আসেন শুদ্ধি-ক্রিয়া সম্পন্ন করতে। তখন "সিমিয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন; তারপর শিশুটির জননী মারীয়াকে তিনি বলেন: "এই যে-শিশু, এ একদিন হবে ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অনেকেরই পতনের কারণ, আবার অনেকের উত্থানেরও কারণ। এ হয়ে উঠবে অস্বীকৃত এক ঐশ নিদর্শন, যার ফলে অনেকেরই গোপন চিন্তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে! আর তোমার নিজের প্রাণও একদিন যেন এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে (*লুক ২:৩৪-৩৫*)।" এই উক্তির মাধ্যমেই সিমিয়োন, যিশু ও মারীয়ার সমগ্র জীবনের দুঃখ কষ্টের ভবিষ্যৎ বাণী করেন।

খ. যিশুকে নিয়ে মিশর দেশে পলায়ন মারীয়ার জীবনে দ্বিতীয় ক্ষত। হেরোদ রাজার নিষ্ঠুরতায় 'স্বর্গদূত স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়ে বললেনঃ "ওঠ! শিশুটিকে ও তাঁর মা'কে সঙ্গে নিয়ে মিসর দেশে পালিয়ে যাও তুমি, আর আমি কিছু না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাক! কারণ হেরোদ শিশুটিকে মেরে ফেলবার জন্যে শীঘ্রই তাঁর খোঁজ করতে শুরু করবে। যোসেফ তখন ওঠলেন আর সেই রাতেই শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে রওনা হলেন (*মথি ২:১৩-১৪*)।" সেই সময় প্রচণ্ড শীতের মধ্যে যোসেফ ও মারীয়া, শিশু যিশুকে নিয়ে এক অজানা-অচেনা দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

গ. বার বছর বয়সে যিশুকে মন্দিরে হারিয়ে ফেলা ছিলো মারীয়ার জীবনে তৃতীয় ক্ষত। যিশু বার বছর বয়সে মা বাবার সাথে পর্বীয় প্রথা অনুসারে জেরুসালেমে গিয়েছিলেন নিস্তার পর্বে যোগ দিতে। কিন্তু ফেরার পথে যিশু সহযাত্রীদের সঙ্গেই আছেন মনে করে যাত্রা করেন। কিন্তু ফিরে যাবার পথে যিশুকে আত্মীয়স্বজন ও জানাশোনা লোকদের মধ্যে খুঁজে না পেয়ে জেরুসালেমে ফিরে গেলেন। তিন দিন পরে তাঁরা মন্দিরেই তাঁকে খুঁজে পেলেন। তাঁর মা তাঁকে বলে উঠলেন: "খোকা,

আমাদের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার? ভেবে দেখ তো, তোমার বাবা আর আমি কত উদ্বিগ্ন হয়েই না তোমাকে খুঁজছিলাম (*লুক ২:৪১-৪৮*)। কোন সন্তান যদি হারিয়ে যায় তাহলে মায়ের মন কি ঠিক থাকতে পারে? মারীয়া খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাই সেই সময় মারীয়াকে ব্যথা-বেদনার মধ্যে থাকতে হয়েছিলে।

ঘ. যিশুর ক্রুশ বহন দর্শন মারীয়ার জীবনে ছিলো চতুর্থ ক্ষত। কালভেরীতে যিশুর ক্রুশ বহন দেখে মারীয়ার হৃদয় বির্দীণ হয়, তীক্ষ্ণ শেল তাঁর বুকে সজোরে বিদ্ধ করে। তবুও তিনি সন্তানের নিদারুণ কষ্টভোগ নীরবে সহ্য করেছেন। আর সন্তানের ক্রুশ বহনের সহযাত্রী হয়েছেন। এটি ছিল মারীয়ার জীবনে আরেকটি অন্যতম ক্ষত।

ঙ. যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু দর্শন মারীয়ার জীবনে ছিলো পঞ্চম ক্ষত। শোকার্ত মারীয়ার জীবনে সর্বোচ্চ কষ্ট হয় যখন যিশুকে কালভেরী পর্বতে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। চোখের সামনে সন্তানের এমন অবস্থা দেখে কোন মা-ই স্থির থাকতে পারে না। তবে মারীয়া নীরব থেকে পুত্র হারানোর যন্ত্রনা সহ্য করেছেন। তিনি নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেননি। বরং তাঁর পুত্রের মধ্যদিয়ে সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায়, সেই চিন্তাই করেছেন। যোহনের মা হয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের সকলেরই জননী। যোহন এখানে সমস্ত খ্রিস্ট বিশ্বসীদের প্রতীক। (*যোহন ১৯:২৫-২৭*)

চ. মারীয়ার কোলে যিশুর মৃতদেহ স্থাপন ছিল শোকার্ত মারীয়ার জীবনে ষষ্ঠ ক্ষত। যিশুর মৃতদেহ ক্রুশ থেকে নামিয়ে মারীয়ার কোলে রাখা হয়। মারীয়া সন্তান হারানোর শোকে দু-চোখে অন্ধকার দেখতে পান। মায়ের কোলে সন্তানের মৃতদেহ তা যে কত কষ্টের, যন্ত্রণার তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তারপরও মারীয়া সবই নীরবে সহ্য করেছেন।

ছ. যিশুর সমাধি দর্শন মারীয়ার জীবনে ছিল সপ্তম ক্ষত। যিশুর মৃতদেহ বাগানের মধ্যে একটি নতুন সমাধিগুহায় নিয়ে রাখা হয়, যেখানে এর আগে কাউকে কখনো রাখা হয়নি। (*যোহন ১৯:৪১*)। পুত্রের সমাধি দেখে মারীয়ার মনে ভীষণ কষ্ট হয়েছিলো। তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। পুত্র শোকে মারীয়া পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।

মা মারীয়া ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য ও অনুগত। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেন। সেচ্ছায় সজ্ঞানে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বলেছিলেন, "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক (*লুক:১:৩৮*)। মারীয়ার জীবনে সাতটি শোকের ঘটনা রয়েছে, তিনি তা ঐশ পরিকল্পনায় ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। সাধু বার্নাড বলেন, "পুত্রের যন্ত্রণাভোগে তোমার এমন সহভাগিতা হল যা সাক্ষ্যমরণের শারীরিক যন্ত্রণার চেয়েও গভীরতর ও তীব্রতর।" মারীয়া প্রকৃত অর্থেই সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্যমর কেননা মারীয়ার মানসিক দুঃখ কষ্ট পৃথিবীর যে কোন দৈহিক কষ্টের চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক। মারীয়ার জীবনে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা প্রকৃত অর্থেই মানব মুক্তিদায়ী কাজের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। তাই এই কারণেই মারীয়া হয়ে ওঠেছেন মধ্যস্ততাকারিণী॥

স্মৃতিচারণ এবং সমবায়ী কিছু কথা

পিটার পল গমেজ

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের প্রয়াত ধর্ম-প্রদেশীয় বিশপ ও যাজকদের জীবন ইতিহাস বইটি হাতে পেয়ে খুবই খুশী হয়েছি। কারণ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করে অনেকের সাথে পরিচয় গড়ে ওঠেছিল। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও জীবন-বৃত্তান্ত জানা ছিল না। যাজক ভ্রাতৃসংঘের সভাপতি এবং কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই এই সুন্দর কাজের জন্য।

স্মৃতিচারণ : ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াপদার কন্সালটিং ইঞ্জিনিয়ারস কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র ষ্টোর-কিপার হিসেবে কাজে যোগদান করি। বিদেশী অফিসের নিয়ম নীতিমালা অনুসারে সময়মত আসা-যাওয়া বিবেচনায় মালিবাগের মোড়ে-জমি ক্রয় করে স্ব-পরিবারে বসবাস শুরু করি। ফলে রবিবার পবিত্র খ্রিস্টযাগ এবং নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানে রমনা ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্ত এবং বিশপ হাউজের পুরোহিত ও সিস্টারদের সাথে পরিচিতি লাভে গর্বিত হয়েছি।

উল্লেখ্য- কানাডা থেকে আমদানীকৃত মালামাল চিটাগাং এবং মোংলা বন্দর থেকে খালাস করে কক্সবাজার, বগুরা এবং দিনাজপুর --- অফিসে যথাসময়ে পৌঁছে দেয়া এবং তদারকির জন্য সর্বদা আমি একটি জীপ গাড়ী ব্যবহার করতাম।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ জানতে পারি পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ মাইকেল রোজারিও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে বিশপ হয়েছেন। একদিন রবিবার খ্রিস্টযাগ শেষে তাঁর সাথে দেখা করে বলি- আমি প্রতিমাসে ২/৩ বার দিনাজপুর যাই। সুতরাং আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবেন, আমি পৌঁছে দেব। তিনি এই কথা শুনে তো অবাক। দুই ট্রিপে সমস্ত মালামাল পৌঁছে দেওয়ায় আশীর্বাদ জনিত ভাষায় বলেন- "বেঁচে থাক এবং সাবধানে গাড়ী চালাবে"। বলা বাহুল্য ৩০(ত্রিশ) বছর গাড়ী চালালেও ঈশ্বরের আশীর্বাদে কোন বিপদের সম্মুখীন হই নাই। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আসা-যাওয়ায় উনার সাথে দেখা করে নানাবিধ আলোচনা ও সান্নিধ্য লাভে ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস জন্মে।

উনি দেবতুল্য: তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে নতুন গির্জা উদ্বোধনকালে ফার্মগেট মোড়ে গাড়ী যানজট এড়াতে ও মানুষ চলাচলের সুবিধার্থে ''ব্যবস্থাপনা কমিটি'' আমাকে দায়িত্ব প্রদান করে। কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকাকালীন সময় আমার কাছে এসে একটি গাড়ী থেমে যায়। জানালার গ্লাস নামিয়ে মহামান্য আর্চবিশপ মহোদয় আমায় ডেকে বলেন- ''পল'' সব জায়গায় তুমি। দৌড়ে হাতের আংটি চুম্বন করে আশীর্বাদিত হই। ভাবতে অবাক লাগে- সর্বদা পালকীয় কাজে ব্যস্ত অথচ আমার নামটি ভুলেন নাই। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ আমার বড় ছেলে ''ফিটসুলা'' অপারেশন করার জন্য মাদ্রাজের ভেলোর জিত্রমসি হাসপাতালে যাবে। অনেক চিন্তা ভাবনা করে মহামান্য আর্চবিশপ মহোদয়ের দ্বারস্থ হলাম। অনুরোধ জানাই কম খরচে সুচিকিৎসার জন্য একটি চিঠি প্রদান করতে। কথা শুনে সিস্টারকে ডেকে হাসপাতালের প্রশাসক বরাবর চিঠি টাইপ করে সিল-মোহর দিয়ে স্বাক্ষর প্রদান করেন। তাঁর উদারতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ একই সাথে অনেক আশ্চর্য হয়েছি।

সামাজিক: সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কল্পে ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং সিএসসি, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: ঢাকা প্রতিষ্ঠা করেন। দূর্ঘটনায় মৃত্যুর পূর্বে সমিতি সুষ্ঠু পরিচালনা করার লক্ষ্যে পরিচালকদের ক্রেডিট ইউনিয়নের মূল-নীতি, রক্ষাকবচ; ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ক সম্পর্কে শিক্ষাদান করিতে পারে নাই। ফলে বানিজ্যিক প্রথায় শিক্ষিত পরিচালকদের দ্বারা সমিতি পরিচালনায় সমাজে নানা ধরণের সমস্যায় জর্জরিত হয়ে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে।

সমস্যা সমাধানে জনদরদী নেতা ক্ষমতাবান নেতার বিরুদ্ধে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ আইন-আদালতের আশ্রয় নেয়। ক্ষমতাবান নেতার অনুসারীবৃন্দ মহামান্য আর্চবিশপ মহোদয়ের নিকট অভিযোগ নিয়ে আসে। ধর্ম ও সমাজে সামাজিক উন্নয়ন রক্ষার্থে ব্যারিষ্টার আলবার্ট বাড়ৈ এবং মাইকেল পি. মালোর সাথে আলোচনায় আদালত থেকে মামলা উঠিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়। দিন তারিখ ও সময় নির্ধারণে তেজগাঁও কমিউনিটি সেন্টারে বাদী এবং বিবাদীকে একত্র করে "আইস, আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি" গানের মাধ্যমে দু'জনার মিলন ঘটায়। কত বড় জনদরদী প্রমাণিত।

বাংলাদেশের প্রয়াত ধর্মপ্রদেশীয় বিশপ যাজকবর্গ পুস্তকে মহামান্য প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন বিষয়ক-সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও দূরদর্শিতা সুন্দর ও সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশের জন্য ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাইকে ধন্যবাদ জানাই। ঈশ্বরের আশীর্বাদ তার জীবনে বর্ষিত হোক ও তার দীর্ঘায়ু কামনা করি॥

ঢাকার শতবর্ষী আর্চবিশপ ভবন

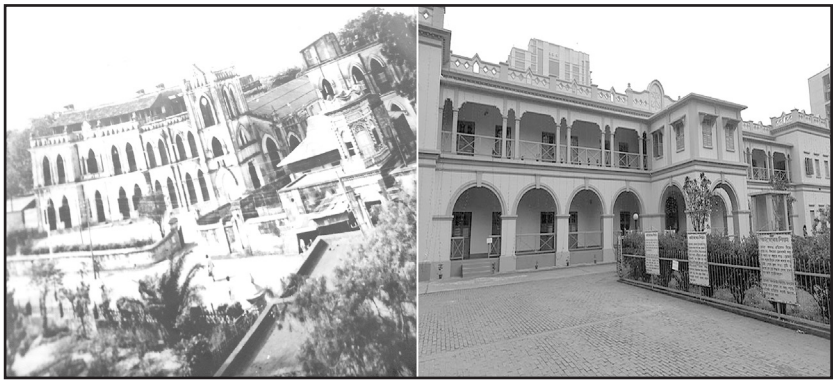

লক্ষীবাজারে বিশপ ভবনের পুরাতন বিল্ডিং কাকরাইলে আর্চবিশপ ভবনের বর্তমান বিল্ডিং

রমনা, ঢাকা আর্চবিশপ ভবন স্থাপনের একশত বর্ষপূর্তি আগামী ১৭ নভেম্বর, শুক্রবার, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে রমনা আর্চবিশপ ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে মূল বিষয় হিসেবে নেওয়া হয়েছে,**"বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও সেবার যাত্রা পথে ঢাকায় শতবর্ষী আর্চবিশপ ভবনের পূর্তি উৎসব"**। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে সকলের অবগতি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একটি বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে।

আর্চবিশপ ভবন প্রতিষ্ঠা বা স্থাপনের তারিখ ও সন নিয়ে আমাদের কারো কারো মনে কিছু সন্দেহ ও প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। যে কারণেই আমার এই লেখা। সন্দেহ দেখা দেওয়া বা প্রশ্ন ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ অনলাইনে বা ইউটিউবে এ বিষয়ে কিছু ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আমরা কেউ কেউ রমনা আর্চবিশপ ভবন ও সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল প্রতিষ্ঠার তারিখগুলো মিলিয়ে ফেলেছি। তাই অনুষ্ঠানটি আয়োজনের আগেই এ বিষয়ে সঠিক তথ্য আমাদের সবার জানা দরকার। সঠিক তথ্যটি জানা থাকলে তখন ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটবে। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে জুবিলী উৎসবটি করতে পারব।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর। সারা দেশ থেকে অনেক লোকের বসবাস এখানে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যেখানে ঢাকা শহরের লোক সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ সেই জনসংখ্যা এখন প্রায় তিন কোটি। এবং বর্তমানে ঢাকা শহরে কাথলিক জনসংখ্যা হবে প্রায় চল্লিশ হাজার। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে ঢাকা আর্চবিশপ ভবনের গুরুত্ব অনেক। কারণ এখান থেকে মহামান্য আর্চবিশপ বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু হিসেবে মণ্ডলীর পরিচালনা দান করে থাকেন।

এখন আমরা একটু পিছনে ফিরে যাব এবং জানতে চেষ্টা করব কোন প্রেক্ষাপটে বর্তমান আর্চবিশপ ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার দ্বিতীয় বিশপ পিটার যোসেফ অ্যার্ত সিএসসি বর্তমান আর্চবিশপ ভবনের প্রাথমিক কাজ শুরু করেন। যদিও তখন তিনি জানতেন না বা বুঝতে পারেন নি যে, এটি একটি বিশপ ভবন ও পরে আর্চবিশপ ভবনে পরিণত হবে। অর্থাৎ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল রমনাস্থ বর্তমান হাইকোর্ট ভবন এলাকায় ১,৩৮৫ টাকায় এক খন্ড জমি ক্রয় করেন। এর প্রধান কারণ ছিল সালেসীয় ক্যাটেখিষ্ট সিস্টারগণের পরিচালনায় লক্ষীবাজার কনভেন্টে অনাথ বালক-বালিকা ও নারীদের সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছিল যে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। সিস্টারগণ তাই এই নতুন জমিতে একটি মাটির দেওয়ালের ঘর ও বাঁশের বেড়ার গির্জিকা নির্মাণ করে অনাথ ছেলেমেয়ে ও দরিদ্র নারীদের নিয়ে বাস করতে থাকেন। এ স্থানকে 'সাধু যোসেফের আবাস' নামকরণ করা হয়। নতুন এই জায়গাটি Poor Man House বলেও পরিচিত ছিল।

লক্ষীবাজার থেকে প্রতিদিন যাজক গিয়ে সিস্টারদের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার পূর্ববঙ্গ ও আসামকে একটি পৃথক প্রদেশে উন্নীত করে ঢাকা শহরকে নতুন প্রদেশের রাজধানীতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেন। নতুন প্রদেশের গভর্ণর ভবনের জন্য রমনার সালেসীয় সিস্টারদের পরিচালিত সাধু যোসেফের আবাসের স্থানটি বেছে নেন। বিশপ অ্যার্তে এতে প্রথমে দ্বিমত ছিল। কিন্তু জায়গাটি রক্ষার করার কোন উপায় না দেখে অবশেষে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জমিটি সরকারের কাছে বিক্রি করে দেন এবং বর্তমান কাকরাইলের আর্চবিশপ ভবনের জমিটি ক্রয় করেন। কিছু সময়ের জন্য সিস্টারগণ একটি ভাড়া বাড়ীতে তাঁদের কার্যক্রম চালিয়ে যান। কাকরাইলের নতুন জমিতে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সিস্টারগণ এখান থেকে তাঁদের কাজ চালিয়ে যান। সালেসীয় সিস্টারগণ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে চলে গেলে এখানকার সব কার্যক্রমই বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে আরএনডিএম সিস্টারগণ এ কাজের পরিচালনা দেন।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে নতুন বিশপ ল্যগ্রাঁ সিএসসি ঢাকায় আসেন। তখন লক্ষীবাজার পবিত্র ক্রুশ ক্যাথিড্রাল-প্রাঙ্গণে বিশপ ভবন, যাজক ও ব্রাদারদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, যাজক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্কুল ইত্যাদি সব একসঙ্গে থাকায় সবার জন্য জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না। এক অস্বস্তিকর ও ঘিঞ্জি পরিবেশ বিরাজ করছিল। এমন অবস্থা দেখে নতুন বিশপ ল্যগ্রাঁ একটি পৃথক বিশপ ভবন নির্মাণের জন্য মন স্থির করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি ফাদার আলফ্রেদ্ ল্যাপয়ের সিএসসিকে দায়িত্ব দেন। ফাদারের তত্ত্বাবধানে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে কাকরাইলের জমিতে বর্তমান দু'তলা বিশপ ভবনের কাজ শুরু হয় এবং পরের বছরই তা শেষ হয়। এ ব্যাপারে ঢাকার তৎকালীন ভিকার জেনারেল ফাদার তিমথী ক্রাউলী পরবর্তীতে যিনি ঢাকার পঞ্চম বিশপ হয়েছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিশপ লাগ্রাঁ তাঁর দলবল সহ নতুন বিশপ ভবনে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

বিশপ ল্যগ্রাঁ ১৯১৬ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার বিশপ হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিশপ তিমথী ক্রাউলী সিএসসি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি একজন জনদরদী বিশপ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সময়কাল ছিল ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সকল স্থানেই তাঁর অবদান স্বীকৃত। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ৬ষ্ঠ বিশপ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বিশপ লরেন্স লিও গ্রেণার সিএসসি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, সাহসী ও দূরদর্শী প্রকৃতির বিশপ। তাঁর সময়েই ঢাকা আর্চডায়োসিসের মর্যাদা পায়। বিশেষ কারণে তিনি পদত্যাগ করলে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খুবই বিনয়ী ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি হঠাৎ মারা গেলে তৎকালীন দিনাজপুরের বিশপ মাইকেল রোজারিও দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিশপ মাইকেল অত্যন্ত সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার সাথে তাঁর উপর অর্পিত পালকীয় দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি পদত্যাগ করেন এবং সে বছরের ৯ সেপ্টেম্বর বিশপ পৌলিনুস কস্তা ঢাকার নবম বিশপরূপে অধিষ্ঠিত হন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর আর্চবিশপ পৌলিনুসের জায়গায় বিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি দায়িত্ব নেন। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক অবসর নিলে ২৭ নভেম্বর বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই ঢাকার আর্চবিশপের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এভাবেই পর্যায়ক্রমে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পালকীয় ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অত্যন্ত সুন্দর ও সফলভাবে চালিত হয়ে আসছে।

তথ্য সূত্র :

১) যেরোম ডি' কস্তা, **"বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী"**, আগষ্ট ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫০১।

২) সুশীল এ. ডি' রোজারিও, রমনা ধর্মপল্লীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৩ (যাজকীয় অভিষেক স্মরণিকা, রমনা, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ)॥

শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন এবং বাংলাদেশ

চয়ন এইচ রিবেরু

আমরা প্রায়ই বলে থাকি বা শুনি যে মন ভাল তো সবই ভাল। আবার অনেকে বলে শরীরটা ভালো। অর্থাৎ আমরা জেনে বা না জেনে শরীর ও মনের বিষয়ে কথা বলি। বাস্তবে আমরা স্বাস্থ্য বলতে বেশীরভাগ মানুষই শারিরীক স্বাস্থ্যের কথা বলি বা বিশ্বাস করি। তাই আমরা পরিচ্ছন্নতা, অসুখ-বিসুখ নিয়ে চিন্তা করি, সুস্থ থাকতে চেষ্টা করি এবং সুস্থতা থাকার জন্য ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। বেশীরভাগ সময় আমরা স্বাস্থ্য বলতে মনে করি শরীরিয় বিষয় কিন্তু মনও স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শরীরের সাথে সাথে মনকেও গুরুত্ব দেয়া জরুরি। আবার মানসিক স্বাস্থ্য মানে মানসিক রোগ না। শরীর সুস্থ থাকলেও এটাকে ভাল রাখার জন্য প্রতিদিন গোসল করি, দাঁত মাজি, পুষ্টি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি, প্রতিদিন ব্যায়াম করি, অস্বাস্থ্যকর খাবার, পরিবেশ, বদ অভ্যাস ত্যাগ করি, তেমনি মনের সুস্থ্যতার জন্য নিয়মিত মনের যত্ন নিতে হয়। পাশাপাশি মনকে সুস্থ্যতার জন্য মনের খাদ্য দিতে হয়, মনের ব্যায়াম করতে হয় এবং মনের জন্য ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে দূরে থাকতে হয়। মন ভালো না থাকলে সার্বিকভাবে সুস্থ্য বা ভাল থ াকতে পারবেন না। অতএব মন ও শরীর একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই মনের সমস্যা হলে শরীরের ওপর প্রভাব পড়ে আবার শরীর খারাপ হলে মনও খারাপ হয়।

আমরা অনেক সময় দু'টো বিষয়কে এক করি, সেটা হল: মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগ। মানসিক রোগ বা সমস্যা হল মনের অস্বাভাবিক অবস্থা, যার জন্য চিকিৎসা নিতে হয়, ঔষধ নিতে হয় এবং সাইকোথেরাপি নিতে হয়। মানসিক স্বাস্থ্যে বিয়ষটি সর্বজনীন। যার কোন মানসিক রোগ নেই তাকেও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হয়, যেন সে মানসিক রোগ থেকে সুস্থ্য থাকতে পারে।

শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন সামগ্রিক সুস্থতার দুটি অপরিহার্য দিক। তারা আন্তঃসংযুক্ত এবং উল্লেখযোগ্যভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে। এখানে উভয়ের একটি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল:

১. **শারীরিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা:** শারীরিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বলতে একজন ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতার জন্য পরিচর্চাকে বোঝায়। যা একজন মানুষকে তার অসুস্থতা প্রতিরোধ, বিদ্যমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতি পরিচালনা এবং সামগ্রিক শারীরিক সুস্থতা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ। শারীরিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মূল উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে:

ক **নিয়মিত মেডিক্যাল চেক-আপ:** নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা অতিব জরুরি। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করতে সাহায্য করে এবং সময়মত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে।

খ. **সঠিক পুষ্টিকর খাবার:** শরীরের সুস্বাস্থ্য রাখতে চাইলে প্রতিদিন পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য একটি সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য অপরিহার্য। প্রয়োজনে আমরা পুষ্টিবিদদের শরণাপন্ন হতে পারি।

গ. **নিয়মিত ব্যায়াম:** ব্যায়াম আমারদের শরীরের রক্তচলাচল, শারীরিক ক্রিয়াকলাপ সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। ব্যায়াম কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে, পেশীকে শক্তিশালী করতে এবং একটি স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে সহায়তা করে। তাই প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট ফ্রিহ্যান্ড ব্যায়াম করা দরকার।

ঘ. **প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:** জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে নানা ধরনের ভাইরাহ, রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, এগুলোর হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য টিকা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা।

চ পর্যাপ্ত ঘুম: আমরা যদি ২৪ ঘন্টাকে ৩ ভাগে ভাগ করি, তাহলে এভাবে ভাগ করা যায়: ১) ৮ ঘন্টা কাজ করা, ৮ ঘন্টা ঘুমানো এবং বাকী ৮ ঘন্টা অন্যান্য কাজে ব্যয় করা। অর্থাৎ পর্যাপ্ত ঘুম মনের ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শরীর ও মন পুনরুদ্ধার এবং মেরামত করতে সহায়তা করে।

২. মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন

মানসিক স্বাস্থ্য যত্নের মূল দিকগুলির মধ্যে রয়েছে:

আমরা প্রথম আলোর একটি শ্লোগান দেখি **"বদলে যাও, বদলে দাও"** অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া দরকার। আর এ বোধ উদয় হওয়া প্রয়োজন যে, মন স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই শরীরের সাথে সাথে মনেরও যত্ন নেয়া অতিব প্রয়োজন।

ক **থেরাপি এবং কাউন্সেলিং:** মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য পেশাদারদের সাথে কথা বলা, যেমন: মনোবিজ্ঞানী বা থেরাপিস্ট যা আপনাকে মানসিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।

খ. ঘুম: প্রতিদিন নিয়ম করে ঘুমাতে হবে। প্রতিটি মানুষের ঘুম এক হয় না, কারো কম কারো বেশি ঘুম হয়। এটা কোন সমস্যা নয়। সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে রাতের বেলায় ঘুমাতে হবে আর দিনের বেলায় কাজ করতে হবে। এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে মাথায় বায়োলজিক্যাল ক্লক উল্টাপাল্টা হবে যায় আর তখনই মনের বা মানসিক সমস্যা হয়। তাই কোনভাবেই রাত জাগা ও দিনে ঘুমানো চলবে না।

গ) **মননশীলতা এবং ধ্যান:** মননশীলতা এবং ধ্যানের মতো অনুশীলনগুলি চাপ, উদ্বেগ কমাতে এবং সামগ্রিক মানসিক সুস্থতার উন্নতি করতে পারে।

ঘ) **স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট:** মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব রোধ করতে পারে স্ট্রেস পরিচালনার স্বাস্থ্যকর উপায় শেখা।

গ **সামাজিক সমর্থন:** মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে কিছু রীতি নীতি, সংস্কার রয়েছে, এগুলো মেনে চলতে হয়। পরিবার এবং বন্ধুদের একটি শক্তিশালী সমর্থন ব্যবস্থা থাকা কঠিন সময়ে ব্যক্তিদের সাহায্য করতে পারে।

ঙ) **বদ অভ্যাস ত্যাগ করা :** কিছু লোক আছে তারা মনে করে সব কিছু সঠিক হতে হবে বা পাফেকসনিষ্ট হতে হবে। সব কিছু নিখুঁত হতে হবে এমন অবাস্তব চিন্তা না করাই ভাল। তাই একেবারে বিশুদ্ধবাদী না হয়ে, সময়মত কাজ সম্পাদন, বদ অভ্যাস এবং নেতিবাচক চিন্তাগুলো ত্যাগ করতে পারলে মানসিকচাপ অনেক কমে যায়।

চ) **পদার্থের অপব্যবহার এড়ানো:** সমাজ স্বীকৃত না বা শরীরের ও মনের জন্য ক্ষতিকর এ ধরণের পদার্থের অপব্যবহার মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাই নিষিদ্ধ পদার্থ ব্যবহারের সমস্যাগুলো এড়ানো বা সাহায্য চাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ছ) **সতর্কতা চিহ্নগুলি সনাক্ত করা:** মানসিক স্বাস্থ্য উদ্বেগের সতর্কতা লক্ষণগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রাথমিক হস্তক্ষেপ এবং উপযুক্ত সহায়তার দিকে পরিচালিত করতে পারে।

জ) **পারিবারিক সুসম্পর্ক:** পরিবার হলো মানুষের প্রথম ও প্রধান শিক্ষালয়। তাই পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সবাই মিলে অন্তত একবার একসঙ্গে খাওয়া, সপ্তাহে নিয়ম করে একসঙ্গে আড্ডা দেয়া, বেড়াতে যাওয়া এগুলো পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে পারে এবং পারিবারিক আড্ডাতে সকল সময় ইতিবাচক আলোচনা করা। এ বিষয়গুলো একজন মানুষকে সামাজিক দক্ষতাগুলো অর্জনে সহায়তা করে।

ঝ) **পাঠাভ্যাস ও বিনোদন:** অফিসের বা পাঠ্যবই ছাড়াও প্রতিদিন নিয়ম করে কিছু বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যা আপনাকে সমৃদ্ধি করবে। এছাড়া সংস্কৃতি চর্চা, সংগীত, ছবি আঁকা, নাচ করা ইত্যাদি মনের অন্যতম খোরাক। এতে মনের পরিচর্যা আরো দৃঢ় হয়। হাস্যরস চর্চা করা, হাসিখুশি থাকা মনের যত্নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ঞ) **সঠিক খাদ্যাভ্যাস:** সময়মত সুষমখাদ্য ও পানি পান করতে হবে। অনিয়মিত খাদ্য

স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আস্তে আস্তে সময় নিয়ে চিবিয়ে খেতে অভ্যাস করা।

ট) **মানসিক সমস্যার চিকিৎসা গ্রহণ:** এ সমস্যা যে কারো যে কোন সময় হতে পারে। বিষয়টি লুকিয়ে না রেখে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করা। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকের পরামর্শে ওষধ গ্রহণ করা ও পাশাপাশি সাইকোথেরাপি বা কাউন্সেলিং গ্রহণ করা।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন উভয়ই সুস্থতার জন্য সামগ্রিক পদ্ধতির অপরিহার্য উপাদান। একটি দিককে অবহেলা করা অন্যটিকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উভয়কেই অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য। আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ যদি শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, তাহলে পেশাদার সাহায্য নেয়ার জন্য সুপারিশ করা।

বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা একটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এটি এখনও উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেশে সীমিত মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থান সহ একটি বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে এবং অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা এবং বোঝার অভাব রয়েছে। বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য এখানে কিছু মূল বিষয় রয়েছে:

১. **মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিতে সীমিত অ্যাক্সেস:** বাংলাদেশে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী এবং পরামর্শদাতা সহ মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারদের অভাব রয়েছে। বেশিরভাগ মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবা শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সঠিক যত্ন অ্যাক্সেস করা কঠিন করে তোলে।

২. **কুসংস্কার এবং বৈষম্য:** মানসিক স্বাস্থ্যকে ঘিরে কুসংস্কার সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাযুক্ত লোকেরা প্রায়শই বৈষম্য এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হয়, যা তাদের সমর্থন চাইতে নিরুৎসাহিত করে।

৩. **জনসচেতনতার অভাব:** বাংলাদেশের অনেকেরই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান রয়েছে, যার ফলে মানসিক স্বাস্থ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা ব্যক্তিদের প্রতি বোঝার এবং সহানুভূতির অভাব রয়েছে।

৪. **প্রাথমিক যত্নে মানসিক স্বাস্থ্যকে একীভূত করা:** প্রাথমিক যত্নের সেটিংসে মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবাগুলিকে একীভূত করার জন্য চলমান প্রচেষ্টা চলছে, যা অ্যাক্সেস বাড়াতে এবং কুসংস্কার কমাতে সাহায্য করতে পারে।

৫.**বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) :** বাংলাদেশে কিছু এনজিও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই সংস্থাগুলি সরকারের প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. **সরকারি উদ্যোগ:** বাংলাদেশ সরকার মানসিক স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করার জন্য কিছু প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে। তারা স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রশিক্ষণ, মানসিক স্বাস্থ্য সুবিধা স্থাপন এবং মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারণার জন্য প্রোগ্রাম চালু করেছে।

৭. **গ্লোবাল মেন্টাল হেলথ অ্যাডভোকেসি:** মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলা করতে এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোতে বৃহত্তর অ্যাক্সেসের প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সহযোগিতাগুলোও বাংলাদেশের সাথে কাজ করছে।

চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার উন্নতির আশা রয়েছে। কুসংস্কার কমাতে, সচেতনতা বৃদ্ধি, আরও মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারদের প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক যত্নে মানসিক স্বাস্থ্যকে একীভূত করার অব্যাহত প্রচেষ্টা শূন্যতা পূরণ করতে এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর সাথে লড়াই করা ব্যক্তিদের জন্য আরও ভাল সহায়তা প্রদান করতে পারে। দেশে আরও ব্যাপক এবং কার্যকর মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা তৈরি করতে সরকার, এনজিও এবং সমাজের স্থির প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

- কীভাবে নেবেন মনের যত্ন - আহমেদ হেলাল
- দৈনিক পত্রিকা
- ইন্টারনেট॥

যিশুসংঘ (জেজুইট) এর পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

প্রিয় কাথলিক ছাত্র-যুবক ভাইয়েরা,

যিশুসংঘের ছত্র-ছায়ায় এসে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু ইগ্নেসিয়াস লয়োলা, সহ-প্রতিষ্ঠাতা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ও পোপ ফ্রান্সিস-এর মত ঈশ্বরের নামে মানুষ ও মন্ডলীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে তোমাদের নিবিড় আমন্ত্রণ জানাই! তোমরা যারা HSC পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ বা এ বছর HSC পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছ বা যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছ ও আহ্বানের জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তোমরা নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারো-

নবজ্যোতি নিকেতন
কুচিলাবাড়ি, মঠবাড়ী, গাজীপুর
ফা: এলিয়াস সরকার, এস.জে. (০১৭৭৮-২২৫৮২৮)
ফা: প্রবাস রোজারিও, এস.জে. (০১৭৩২-৮৭৫৬৯০)

আহ্বান পরিচালক
১৪২/১এ মনিপুরীপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

ভবানীপুর ধর্মপল্লী
ভবানীপুর, বনপাড়া, নাটোর
ফা: রোহিত মৃ, এস.জে. (০১৭৪৩-১৫৫১৪২)
ব্রা: মানিক মার্ডী, এস.জে. (০১৩১৫-৬৮২৬৭৭)

বিজ্ঞ/২৮৮/২৩

প্রকৃতির আর্তনাদ ও সবুজ পৃথিবীর সুন্দর জীবন

দাউদ জীবন দাশ

পরিবেশ বাঁচাই আন্দোলন এবং পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি বর্তমান সময়ে শিক্ষার এক অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হতে চলেছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের দেশেও পরিবেশবিদ্যা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগামীদিনে শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর থেকে পরিবেশবিদ্যা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করার জন্য মানুষ যে একমাত্র দায়ী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী ও উদ্ভিদের বসবাস। মানুষ তার মধ্যে একটি। আবার সভ্য মানুষ তার মধ্যে ব্যতিক্রমও বটে। মানুষই একমাত্র প্রজাতি যে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সভ্য জীবনযাপন করে। আর সমস্যার সৃষ্টি সেখানে। মানবসভ্যতা জন্ম দিয়েছে কৃষি, শিল্প, শহর-নগর ইত্যাদি। অন্যান্য প্রজাতির মোট সংখ্যা থেকে মানব জনসংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যাওয়ার প্রকৃতি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। অন্যান্য প্রজাতির কাছে মানুষ সঙ্কটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে অনেক প্রজাতির প্রাণী উদ্ভিদের বিলুপ্তি ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। প্রারম্ভিকভাবে মানুষ এতে উপকৃত হলেও বর্তমানে মানুষ নিজেই সংকট ডেকে আনছে। মানুষ যত সভ্য হোক, বিজ্ঞানের যত বিকাশ ঘটুক না কেন, প্রকৃতিকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করে মানুষ যে বাঁচতে পারে না, সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না, দেরিতে হলেও মানুষ আজ তা অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছে। এ বোধদয় ঘটার ফলে আজ সর্বত্র ত্রাহি রব, পরিবেশ রক্ষায় অপরিহার্য সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তোলার ব্যাপক প্রচেষ্টা। পরিবেশ রক্ষায় গাছপালার ভূমিকা যে সর্বাধিক তা বলা বাহুল্য। জীবন জগতে খাদ্য বা শক্তির যোগান উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে, অন্য কোন প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না। সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট বা গ্লুকোজ নামক মৌলিক খাদ্য উপাদান প্রস্তুত করে। তারপর পর্যায়ক্রমে তার রূপান্তর ঘটে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে স্থানান্তরিত হয়ে শক্তির যোগান দেয়। প্রত্যেক প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শক্তির জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, তা সে মাংশাসী হোক বা নিরামিষাশি হোক। তাই উদ্ভিদ হলো উৎপাদক আর বাকি সব প্রাণী ভক্ষক। এক কথায় উদ্ভিদ ছাড়া এ পৃথিবীতে জীবন অকল্পনীয়। পরিবেশ রক্ষায় উদ্ভিদের ভূমিকা অতি ব্যাপক। উদ্ভিদ বাতাসে বিভিন্ন গ্যাসের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অত্যধিক হলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় কারণ ঐ গ্যাস তাপ শোষণ করে রাখে। বর্তমানে গ্রীনহাউস এফেক্ট নামে যা সুপরিচিত, সেটি এ কারণে হয়। উদ্ভিদ

বাতাস থেকে কার্বণ-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে গ্রীনহাউস এফেক্টের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। অপরদিকে বাতাসে অক্সিজেন যোগ করে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত বজায় রাখতে সাহায্য করে। এভাবে উদ্ভিদ বায়ু দূষণ কমিয়ে বাতাসকে বিশুদ্ধ রাখে।

উদ্ভিদ বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে। উদ্ভিদের অভাবে উর্বর উৎপাদনশীল মাটি ধীরে ধীরে মরুভূমিতে পরিণত হয়। মাটির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য বৃষ্টিপাত দরকার। বৃষ্টিপাত ঘটাতে গাছপালা আবশ্যক।

ভূমিক্ষয় রোদে উদ্ভিদের ভূমিকা অপরিসীম। গাছপালা বৃষ্টির প্রচণ্ড গতি ও শক্তিকে প্রশমিত করে ভূমিকে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করে। গাছপালার শিকড় মাটিকে আঁকড়ে বেঁধে তার ক্ষয় রোধ করে।

জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে গাছপালা অপরিহার্য। অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা উদ্ভিদ করে থাকে। গাছপালা থেকে মানুষ খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি পেয়ে থাকে, অধিকন্তু গাছপালা পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে মানুষের মনে আনন্দের উদ্রেক ঘটায়। পরিবেশ দূষণ কমিয়ে এবং পরিবেশ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে উদ্ভিদ মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়ের উন্নতির সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদের অপরিসীম গুরুত্ব শুধু বর্তমানকালে নয়, প্রাচীনকাল থেকে মানুষ উপলব্ধি করে আসছে। প্রাচীনকালে প্রকৃতির আরাধনা হত, বৃক্ষের পূজা করত এক শ্রেণীর লোক। অনেক পীর-ফকিরের আস্তানা তৈরী হচ্ছে বৃক্ষতলে। বর্তমানে আমরা যে পরিবেশ সংকটে ভুগছি তার জন্য আমরাই সম্পূর্ণ দায়ী। তাই এ সংকট থেকে মুক্তির জন্য প্রত্যেকের কিছু করণীয় আছে। নগরায়ন, শিল্পায়ন, কৃষির আধুনিকীকরণ ইত্যাদির ফলে পরিবেশ সংকট বেড়ে চলেছে। অথচ শিল্পায়ন-নগরায়ন ও প্রযুক্তির গতি থামানো বা কমানো মোটেই সম্ভব নয়। তাই দরকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা। এ ক্ষেত্রে উদ্ভিদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আর উদ্ভিদের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষ কিছু অবদান রাখতে পারে। শুধু চাই মানুষের মনোভাব আর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন; চাই পরিবেশ সচেতনতা।

আজকাল আনুষ্ঠানিকভাবে গাছপালা লাগানোর কথা অনেক শোনা যায়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গাছপালা লাগানোর ব্যবস্থা করে থাকে। ঘটা করে পালিত হয় পরিবেশ দিবস। নির্ধারিত কর্মী ও অফিসারও নিয়োগ পায়; কিন্তু তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিছক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বাস্তবে এতে পরিবেশের তেমন উপকার হয় না। এক ঋতুতে রোপণ করা বৃক্ষের চারা পরবর্তী ঋতুর সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয় না। নামিদামী ব্যক্তি যাঁদের পা

মাটিতে পড়ে না, তাঁদের হাতে রোপণ করা গাছের চারা কি আর বৃক্ষে পরিণত হতে পারে? গাছ লাগিয়ে তাঁরা প্রচারের আলোয় আসেন বটে কিন্তু তাঁদের লাগানো গাছ পরবর্তী ঋতুর আলো দেখতে পায় না। গাছ লাগানোর জন্য গাছের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা, প্রকৃতি প্রেম চাই। আধুনিক মানুষের যান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন চাই। পরিবেশ নিয়ে আমাদের উদ্বেগ ক্লাসরুম, সেমিনার, সভা-সমিতি আর ভাষণে সীমিত থাকলে চলবে না। তার বাস্তব প্রতিফলন দরকার। আনন্দের কথা আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষিত, কমশিক্ষিত এমনকি অশিক্ষিত অনেক মেয়েরা নার্সারী এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যবসা করে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলছেন। বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গের মেয়েরা নার্সারী ব্যবসায় জড়িত। এক্ষেত্রে তাদের অবদান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রেও নারীরা এগিয়ে আসছেন। তারা বৃক্ষরোপণ করছেন, রক্ষণাবেক্ষণ-পরিচর্যা করে বড় করছেন। এ থেকে তারা প্রচুর আয় করছেন। নারীরা আজকাল কাঠ ও বাঁশ থেকে কুটির ও হস্তশিল্পের নানাবিধ দ্রব্যাদি তৈরি করে বাজারজাত করে প্রচুর অর্থ আয় করছেন। এসব বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায় নার্সারী ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মেয়েরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিচ্ছে। কিছুটা হলেও নারীদের বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সরকার থেকে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করলে নারীরা এসব কাজে এগিয়ে আসতে আরো উৎসাহ বোধ করবে। পরিবেশ সংকট সম্পূর্ণ রোধ করা সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের বাইরে হলেও তার মাত্রা অনেক কম করা সম্ভব। গাছপালা পরিবেশ দূষণ সম্পূর্ণ রোধ করতে পারে না ঠিক তবে সেটিকে অনেকটা কম করতে পারে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এ কাজ সাধারণ মানুষের নাগালের একেবারে ভিতরে। বাড়ী, রাস্তাঘাট, সরকারী অফিস, স্কুল-কলেজ সর্বত্র কিছু পরিমাণে গাছপালা লাগানো সম্ভব। এ ব্যাপারে সবাই আন্তরিক হলে আমাদের পরিবেশকে অনেকটা দূষণমুক্ত ও সবুজ করে তোলা যায়। তবে শুধু গাছ লাগানোই শেষ কথা নয়, তাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। তাই গাছ লাগাতে হবে মাটির দিকে চেয়ে, ক্যামেরার দিকে নয়। সত্যিকার অর্থে প্রকৃতির সাথে মানুষের সখ্যতা, সম্পর্ক ও প্রেম গড়ে তুলতে হবে যেন মানুষ প্রকৃতির দুঃখ-বেদনা-কান্না এবং আর্তনাদ শুনতে পায় এবং হৃদয় থেকে সাড়া দেয়॥

হারানো দিনের তৃতীয়াংশ

বেঞ্জামিন সুবুলী গোমেজ

কৈশোর আর যৌবনের উদ্দামকে সঙ্গে করে আমরা চলার পথে সুখ-দুঃখকে সাথে নিয়ে কাটিয়ে দেই অনেকটা সময়। পিছন ফিরে দেখার সময় থাকে না। এমন অনেক কিছু থাকে যা উপলব্ধি করার সময় পর্যন্ত আমারা পাই না। শুধু দৌড়াতে থাকি স্বপ্ন পূরনের আশায়। স্বপ্ন পূরন হয়ে যাওয়ার পর, সমস্ত চাওয়া পাওয়া মিটে গেলে একটা সময় আসে যখন পিছনে ফেলে আসা স্মৃতিগুলো সমান গতিতে আসতে থাকে। কোন অবস্থায়ও ওগুলো মন থেকে দূরে নেওয়া যায় না।

একটা সময় ছিল যখন প্রতিটা পরিবারের সদস্য ছিল বড় আকারের। তখনকার সময়ের পরিপেক্ষিতে বেশী ছেলেমেয়ে থাকাটা হয়তো গর্বের বিষয় ছিল। তাই প্রায় সব বাড়ীতেই দেখা যেত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হৈ চৈ পূর্ণ পরিবেশ। সমাজ ব্যাবস্থার ও পারিবারিক অবস্থার চাপে আগের দিনে মায়েদের ঘরের কাজ ছাড়া বাইরে খুব একটা চলাচল ছিল না। সারাক্ষণ সাংসারিক কাজ নিয়েই কাটতো তাদের দিন। বাড়ীর কর্তাই থাকতেন রোজগারের একমাত্র উৎস। যে বাড়ীতে ছয়-সাত জন ছেলে-মেয়ে এবং একজন উপার্জক, সে সব ঘরের আর্থিক অবস্থা অতি সহজেই অনুমান করা যায়

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী দ্বারা পাক-ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়। ইংরেজদের দুইশত বছরের শাসন কালে, মুষ্টিমেয় কয়েকটা ঘাটিতে তারা বিশেষভাবে উন্নতিসাধন করে। তার মধ্যে ছিল কলিকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজ। ঢাকার তেমন কোন উন্নতিসাধন হয়নি। আমাদের পূর্ব-বাংলার লোকজন, যারা চাকুরীজীবী ছিলেন তারা বেশীর ভাগই কাজ করতেন কলকাতা সহ ভারতের অন্যান্য রাজ্য গুলোতে। ৪৭ এর দেশ ভাগের পরও তাদের অনেকে দেশে ফিরেননি এই ভয়ে যে চাকুরী পাওয়া যাবে না। এটা ভাবাও অস্বাভাবিক ছিল না এ কারণে যে, ঢাকাতে তখন চাকুরীর সুযোগ-সুবিধাগুলো তেমন ভাবে গড়ে ওঠেনি।

এ ছাড়াও তখনকার সমাজ ব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় লোকজনের মধ্যে চাকুরী করার প্রবণতাও তেমন একটা ছিল না। অনেকেই নিজ নিজ ভাবে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকতেন, যেমন- পৈত্রিক জমিজমা দেখাশুনা করা, চাকর-বাকর নিয়ে চাষাবাদ করা, অনেকের আবার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়া। যারা একটু বেশী বিত্তবান ছিলেন তাদের ছিল বিভিন্ন ধরনের শখ। শিকারে গিয়ে শিকার করা, মাছ ধরা, বর্ষায় নৌকা বাইচ, গরু দৌড় বা গরুর রশি ছিরান ইত্যাদি। পরবর্তিতে চাকুরীর কিছু কিছু সুযোগ হওয়াতে একটা শ্রেণী চাকুরীর দিকে ঝুঁকে যায়।

চাকুরী বলতে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য বাবুর্চি চাকুরীটা সহজলভ্য হওয়াতে অনেকেই এ চাকুরীর দিকে ঝোকে যায়, বর্তমানে তারা সেফ্ বলেই বিশেষভাবে পরিচিত। এরা কেন সেফে চাকুরীতে ঝুঁকে, তা বলতে গেলে আমাদেরকে আরও একটু গোড়ার দিকে যেতে হয়। আমি আমাদের এলাকার কথাই বিশেষ করে বলছি, আমাদের তুইতাল সহ আঠারটা গ্রামের সমন্বয়ে এ এলাকার খ্রিস্টান সম্প্রদায় কয়েকটা মিশনের অধীনে অনেক কাল যাবৎ বসবাস করে আসছে। আমাদের তুইতাল মিশনের পুরান গির্জার নির্মাণকাল সময় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে (ভুল হলে সংশোধন করা যেতে পারে)। তার আগে ১২০ বছর তুইতাল হাসনাবাদ মিশনের আওতাধীন থাকার পর ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে তুইতাল ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বলা বাহুল্য যে তুইতাল গির্জা হওয়ার কথা ছিল বকচরে এবং হয়েছিলও তাই। কাল বৈশাখীর ঝড়ে গির্জার ক্ষতির কারণে এবং স্থানীয় কিছু অসুবিধার জন্য বকচরে গির্জা না হয়ে তুইতালে নূতন গির্জা গড়ে ওঠে। বকচরে জমি ক্রয় করা হয়েছিল হাসনাবাদ গির্জা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সমসাময়িক কালে; সম্ভবতঃ ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে (খ্রিস্টাব্দ কথায় অনেকের দ্বিমত রয়েছে)।

মিশন পরিচালিত হতো জেজুইট ধর্মব্রতী বিদেশী ফাদারদের দ্বারা এবং যে কারণে সমস্ত কাথলিক মিশনগুলো একটা নিয়মের মধ্যদিয়ে চলতো। মিশনের গির্জার সাথে একটা স্কুল অবশ্যই থাকবে, যে স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত থাকতে হবে। যেহেতু আপামর জনগণের বিশাল একটা অংশ, বিশেষ করে গ্রামে, পড়াশুনা জানতো না তাই স্কুলগুলো খুবই ফলপ্রসূ ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষকে বিদ্যালয়ে এসে বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট করানোটাই ছিল কঠিন কাজ।

এ আঠার গ্রাম অঞ্চলের অনেকেরই তাদের নিজেদের চেষ্টা থাকা সত্যেও বিভিন্ন কারণে লেখাপড়া হয়নি। কিছুদিন এরা বাড়ীর কাজে বাবা-চাচাদের সাহায্য করে কাটাতো আর আমোদ-ফুর্তি করতো। তারপর সুযোগ বুঝে পরিচিত কাউকে ধরে স্থানীয় মিশনের

ফাদারের একটা চিঠি সম্বল করে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হতো। সেখানে কোন হোটেলে বা সাহেবদের ঘরে কাজ করে নিজেদের দক্ষ করে তুলতো।

এছাড়াও, বৃটিশ ও পর্তুগীজদের অধীনে থাকার কারনে তাদের শিখান কাজ বাবুর্চি কাজটাকেই বিশেষভাবে আয়ত্ব করে নেয় এবং পরবর্তীকালে এ কাজটাকেই সহজ ভেবে অনেকে পেশা হিসাবে বেছে নেয়।

ক্রমান্বয়ে এরা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে তাদের এ দক্ষতা ছড়িয়ে দেয়। ফলে পর্যায়ক্রমে এক জেনারেশন থেকে অন্য জেনারেশনে এ পেশাটা চলতে থাকে। যে কারণে আমাদের এ অঞ্চলের সেফদের সুনাম সারাদেশে ছড়িয়ে আছে। এমন কি বিদেশে ও এরা তাদের সুনাম অক্ষত রেখেছে।

যাহোক যা বলছিলাম, এক সময়ে দেখা গেল এলাকার বেশীর ভাগ পুরুষ জনগোষ্ঠিই কাজ করছে ভারতে। (পরবর্তিতে অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের দিকে মোড় নিয়েছে।) ফলে, পরিবার-পরিজন পূর্ব-বঙ্গে আর বাড়ীর কর্তা কাজ করতেন কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গে)।

ইংল্যাণ্ডের শাসকরা পাকিস্তান এবং ভারত নামে দুই দেশকে পৃথক করে, কি করে মারামারি - কাটাকাটি করতে হয় তা শিখিয়ে স্বাধীন করে দেয়। দু'টো আলাদা রাষ্ট্র হওয়াতে পাসপোর্ট ভিসার কথাটাও আসে। তারপর পাকিস্তান-ইণ্ডিয়া দন্দ্ব তো লেগেই ছিল। যারা বিশেষ করে মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবী কলকাতায় কাজ করতেন তাদের জন্য দেশে টাকা পাঠানো বা ছুটিতে যাতায়াত করাটা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। এমতাবস্তায় মা'দেরই বাড়ীর জমি-জমা থেকে শুরু করে ছেলে- মেয়েদের লেখা-পড়া, সবকিছুই দেখাশুনা করতে হত।

পঞ্চাশ-ষাট দশকের দিকে মুষ্টিমেয় কিছু যুবক লেখা-পড়া করে অফিসে চাকুরীতে জয়েন্ট করেছেন। এ অফিসারগণ সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পুরো কাজ করতেন, আর শনিবার হলেই অর্ধেক অফিস করে লঞ্চে করে বাড়ীর দিকে রওনা হতেন। তখন ঢাকা থেকে বাড়ীতে আসার এক মাত্র রাস্তা ছিল নদী পথে লঞ্চে। পরবর্তিতে কিছুটা পথ অবশ্য বাসে করে আসা যেত। সময় লাগতো প্রায় সাত থেকে আট ঘন্টা। লঞ্চঘাট ছিল বাড়ী থেকে এক ঘন্টার হাটার রাস্তা। বর্ষায় ছিল নৌকা। যেহেতু অফিস শেষ করে রওনা হতে হ'তো তাই তাদের আসতে রাত হয়ে যেত। শনিবার হলেই আমরা অধীর আগ্রেহে অপেক্ষা করতাম দাদার আসার অপেক্ষায়। আমার বড়দা, যিনি কলকাতা থেকে পড়াশুনা শেষ করে ঢাকায় এক সওদাগরি অফিসে চাকুরী শুরু করেছিলেন। তখন রবিবার দিন সরকারী ছুটির দিন ছিল, সাধারণত শনিবার ছিল হাফডে। তাই হাফডে অফিস করে বাড়ীর দিকে ছুটে রওনা হয়ে যেত। রাত হয়ে যাওয়ার কারণে দু'সপ্তাহ পর পর শনিবার লঞ্চঘাট থেকে তাদের এগিয়ে আনার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হ'তো দল বেঁধে। যেহেতু রাস্তাঘাট খুব একটা ভাল ছিল না তাই সবাই সাবধানতার সাথে চলাচল করতো। তাছাড়া সন্ধ্যায় বা রাতের অন্ধকারে চুরি-ডাকাতির বেশ কিছুটা প্রবণতা ছিল এবং সাপ-ব্যাঙের ভয়ও ছিল। তৎকালীন সময়ে অত্র অঞ্চলে কোন বিজলি বাতির ব্যবস্থায় ছিল না। কাজেই সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথেই সমগ্র এলাকা জুড়ে নেমে আসতো ঘোর অন্ধকার। খুবই মজা হতো। তখন ডিসেম্বরের মাঝা-মাঝি থেকে মে-জুন পর্যন্ত লঞ্চঘাট ছিল বালুগুণ্ডায়। কালিগংগা দিয়ে লঞ্চ ধলেশ্বরী হয়ে বুড়ীগঙ্গার উপর দিয়ে সদরঘাটে থামত।

বালুগুণ্ডার কথায়, অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। তখন বালুগুণ্ডা যেতে হলে দু'টো রাস্তা ছিল। বলা বাহুল্য যে, এ লাইনের লঞ্চের চলাচল বর্ষায় হতো না। পানির পরিমান বেড়ে গেলে বান্দুরার লাইনে ইছামতি নদী দিয়ে লঞ্চ চলাচল করতো। আর তখন সবাই বান্দুরা হয়ে নদী পথে যাতায়াতের সুযোগ বেড় করতো। তা'না হলে, হয় বাসের একটা রাস্তা দিয়ে বক্সনগর হয়ে আসা যেত অথবা বালুগুণ্ডা দিয়ে আসতে হ'তো। বক্সনগর যাওয়ার রাস্তা ছিল নৌকা করে বা পায়ে হেঁটে। আর যে বাস গুলো এ লাইনে চলাচল করত, সবাই রসিকতা করে বলতো 'মুড়ির টিন'। মুড়ির টিনের ভিতর মুড়ি যেভাবে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে রাখা হয় ঠিক তেমনি ভাবে ঝাঁকিয়ে বাসে মানুষ ভরা হোত। খুবই কষ্টে মানুষ বাসে করে ঢাকা আসা-যওয়া করতো বা ঐ রোডে চলাচল করতো।

হ্যাঁ, বেশীরভাগ সময়েই পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে বালুগুণ্ডা লঞ্চঘাটে। একটা রাস্তা ছিল আনুখালী চকের উপর দিয়ে, অন্য রাস্তা ছিল বাংলাবাজার ঘেসে যে সড়ক রামচরনের বাড়ীর সামনা দিয়ে সোজা পুবদিকে চলে গেছে সেই রাস্তা দিয়ে।

রামচরনের বাড়ীর পরই ডান দিকের বিশাল এক এলাকা জুরে কালিগঙ্গার তীর পর্যন্ত আখ চাষ হতো। সড়ক থেকে ডানদিকে নেমে দু'পায়া একটা রাস্তা সোজাসুজি চলে যায় নদীর লঞ্চঘাট পর্যন্ত। কালীগঙ্গা ছিল খুবই খড়স্রোতা নদী। এর যে পার (কিনারা) আগে আমরা দেখেছি, এখন তার প্রায় দুই-আড়াই মাইল দূরে চলে গিয়েছে (তারও বেশী হতে পারে)।

পায়ে হাঁটার পুরোটাই ছিল আখক্ষেত। কৃষকদের দেখা যেত মেশিন দিয়ে আখের রস বেড় করে আখিগুড় করতে। বড় একটা পাত্রে আখের রস জ্বাল দিয়ে গুরু তৈরী করতো। আমরা আসা-যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে দেখতাম। দেখতে খুবই মজা লাগতো। ঘানীর গরু দ্বারা ঘোরান হতো, আর পাশেই লোক থাকতো যারা আখগুলো পরিষ্কার করে ছোট ছোট করে কেটে রেডি করতো এবং এগুলোকে ঘানীর ভিতর দিয়ে যেত। অন্যদিক দিয়ে আখের রস বড় একটা পাত্রে পরতো। অন্য দু'জনে ঐ রস নিয়ে জ্বাল দিত। আর জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করতো আখের খোসা। আখের রস বের করার পর শুকনো খোসাটাই জ্বালানী। অনেক সময় গরম আখিগুড় আমাদের খেতে দিত। কি যে ভাল লাগতো টাটকা গুড় খেতে! সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

মনে পড়ে সেই সময়ের খেজুরের রসের কথা। মাঘ আর পৌসের সন্ধ্যায় কাঁচা রসের ঘ্রাণ এবং শীতল আমেজে মনকে উতালা করে দিত। মা ঘরে তৈরী করতো খেজুরের গুড়, সাথে নারিকেল দিয়েও করতো খেজুরের গুড়। খেজুর গাছের রস জ্বাল দিয়ে বোতলে রাখা হতো, যা চিতই পিঠা দিয়ে খেতে চমৎকার, অনেকেরই একটা পছন্দের খাবার। সেই রসের কিছুটা দিয়ে মা বানাতো মোয়া। ঘরে তৈরী মুড়ি দিয়ে বানানো সে মোয়া খেতে ছিল অতিব সুস্বাদু। অবসর সময়ে ঘরে ঢুকে হাতের কাছে খাবার না পেলেও মোয়া থাকতো টিন ভর্তি।

সকাল বেলা রসের আনাগোনা, রস জ্বাল দেওয়া এবং তা' দিয়ে গুড় তৈরী করা, এ যেন শীত পার্বণের এক অংশ। সারাবাড়ী জুড়ে মাছি, মৌমাছির সমারোহ। তখন এ সমস্ত ব্যাস্ততাগুলো খুবই বিরক্তি বোধ হতো। কিন্তু মহাকালের বুকে হারিয়ে যাওয়া শৈশব ও কৈশোরের সোনালী সেই স্মৃতিভাণ্ডার থেকে স্মৃতিগুলো এখন বার বার হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায়। অনেক কিছুই মনে পড়ে, তারপরও কিছু কিছু জিনিষ যা নাকি এপরিবেশে এসেও মনকে সার্বক্ষনিক নাড়া দেয়। মা, মাটি আর মানুষ মনকে বড় দুর্বল করে দেয়। মনে হয় সেই গহনের চকের ডাংগার পারের হিজল গাছের নীচের চৈত্রের দুপুরের সিক্ত মাটির গন্ধ, যেখানে বসে পাঠ্যপুস্তকের অনেক পড়াই প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করেছি। প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার যে এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলাম, তা আর কোথাও খুঁজে পাইনি। গোধুলি লগ্নে সূর্যের শেষ রশ্মির সাথে আধারের যে শুভমাঙ্গলীকের খেলা, যা না দেখলে অনুভব করা যায় না-তার মাধুর্য্যতা আর স্নিগ্ধতা। ভাবতে ভাবতে অনেক সময় নিজে নিজেই পুলকিত হয়ে উঠি, বড় ইচ্ছে হয় সেই সময়ে আবার ফিরে যেতে, কিন্তু তা তো হবার নয়!

তাইতো নিজের অজান্তেই শব্দে বেড়িয়ে যায়
কবি গুরুর সেই লাইন--

" কিছু জানি নাই কিছু বুঝি নাই,
জানিলে কি সাধের শৈশব সোনার শৈশব
এমনি হারাই।

দানশীলতার প্রতিদান

রোজলিমা রোজারিও

মধ্যবয়সী নারী লিলিয়ান। একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে। মহামারি করোনার কারণে কোম্পানির অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে যায়। কোম্পানির ব্যয় সংকুচিত করার জন্য তাকে সহ মোট ১০জনকে বরখাস্ত করা হয়। লিলিয়ান দিশেহারা হয়ে যায়। কী করবে এখন? যদিও তার স্বামী ভালো চাকরি করে তবুও লিলিয়ান হতাশা অনুভব করে। ২০ বছর ধরে চাকরি করছে! শিক্ষিত, স্মার্ট, স্বাবলম্বী নারী! কিছুতেই এ অবস্থা মেনে নিতে পারছে না। মাস শেষে হাত-খরচের জন্য স্বামীর কাছে হাত পাততে ভীষণ প্রেসটিজে লাগছে! কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। এই বয়সে, এই দূর্যোগময় মুহূর্তে কে তাকে চাকরি দিবে। বাসায় কাজের লোকও নেই। ছোটা বুয়া দিয়ে কাজ করায়। ঘর ঝাঁড়ু-মোছা, কাপড় ধোঁয়া এবং যেদিন কাপড় ধোঁয়া না থাকে সেদিন ফার্নিচার পরিষ্কার করে দেয়। সপ্তাহে ২দিন কি ৩ দিন সঘোষিত ছুটি কাটায়। নাম তার সালমা। বয়স ২৬ কি ২৭ হবে। তবে সালমার মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করা গিয়েছে সে খুব বিশ্বস্ত। বাড়তি কোনো চাহিদাও নেই। টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র এখানে সেখানে রেখে দিলেও সেটা নেয় না। বরং গুছিয়ে রাখে এবং এটা দেন, সেটা দেন এরকম কোনো বাড়তি আবদারও তার মধ্যে নেই। তাই লিলিয়ান তাকে ছাড়ে না সঘোষিত ছুটি কাটালেও। তবে মাঝে মাঝে এ আচরণের কারণে ভীষণ রাগ হয়, বিরক্ত হয়। সেটা প্রকাশও করে সালমার কাছে। কিন্তু সালমা চুপ করে থাকে। কোনো কথা বলে না।

লিলিয়ানের মন ভালো থাকলে মাঝেমধ্যে সালমার সাথে একটু গল্পগুজব করে। সালমা তার সুখ-দুঃখের গল্প শেয়ার করে। যখন তার ৪ বছর তখন তার বাবা মারা যায়। ২ ভাই, ৩ বোন তারা। সবাই বিয়ে-শাদি করে যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ার কারণে সালমা ও তার মা মহা বিপদে পড়ে যায়! তখন সালমা তার এক ভাইয়ের কাছে থাকে এবং তার সন্তানদের দেখাশোনা করে ও পাশাপাশি পড়াশোনা করে। আর সালমার মা আরেক ভাইয়ের কাছে থাকে। এভাবে দিন চলতে থাকে। সালমা যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে তখন তাকে বিয়ে দিয়ে দেয় তার ভাই। কারণ ভাইয়ের সন্তানরা এখন বড় হয়ে গিয়েছে। সালমা এখন বোঝা হয়ে গিয়েছে তার ভাইয়ের কাছে। বোঝার ভার লাঘব করার জন্য বিয়ে দিয়ে দেয়। জামাইয়ের অবস্থাও ভালো নয়। রিক্সা চালায়। অভাব-অনটনেই দিন চলতে থাকে। বিয়ের ৪বছর পর একটি মেয়ে হয় বহু চেষ্টার পর। আসলে দাম্পত্য জীবন কী সেটা বিয়ের পরও সালমা বুঝতে পারে না। বুঝবেই বা কী? বয়স-তো তার হয়নি বোঝার মতো! মেয়ে হবার পর অভাব-অনটন আরও বেড়ে যায়। কারণ খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে! তাই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভাগ্যান্বেষণে চলে আসে ঢাকা শহরে মেয়েকে তার মায়ের কাছে রেখে। স্বামী রিক্সা চালায় আর সালমা বিভিন্ন বাসায় ছোটা বুয়ার কাজ করে। এভাবেই ৭বছর কেটে গিয়েছে ঢাকা শহরে। গ্রামে মা ও মেয়ের খরচ সালমাই চালায়। সালমার গল্প শুনে লিলিয়ানের মন ভারাক্রান্ত হয়। এক ধরনের টান ও মায়া অনুভব করে সালমার প্রতি।

লিলিয়ান এখন অনলাইন বিজনেস শুরু করেছে। খাবার নিয়ে কাজ করে। মোটামুটি ভালোই আয় হচ্ছে। মাস শেষে হাত-খরচের টাকাটা এখন আর স্বামীর কাছে চাইতে হয়না। এছাড়া ২ মেয়ের ছোটোখাটো চাহিদাগুলোও পূরণ করতে পারছে। এরমধ্যে হঠাৎ করেই সালমা ৩ দিন ধরে কাজে আসছে না। ফোনেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে লিলিয়ানের অবস্থা খারাপ! সংসারের সমস্ত কাজ এবং সেইসাথে অনলাইন বিজনেস! তাও আবার খাবার নিয়ে। হুটহাট অর্ডার চলে আসে। তখন বিপাকে পড়তে হয় বেশ!

৩ দিন পর সালমা আসলো। এদিকে লিলিয়ান রেগেমেগে অস্থির! সালমা আসলেই জিজ্ঞেস করলো কেন আসেননি এতদিন? সালমা বলল, তার মা অনেক অসুস্থ! হাসপাতালে ভর্তি! অপারেশন করতে হবে। জরায়ু নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। অনেক বছর ধরেই এই অবস্থা। লজ্জায় এতদিন কিছু বলেনি। হাঁটাহাঁটি করতে অসুবিধা ও ব্যথার কারণে থাকতে না পেরে এখন বলতে বাধ্য হয়েছে। সালমার কথা শুনে লিলিয়ানের মন নরম হয়ে যায়। চিন্তা করতে থাকে চিকিৎসার জন্য-তো অনেক টাকার প্রয়োজন! সালমা এত টাকা জোগাড় করবে কোথা থেকে? মনের মধ্যে কথাটা চেপে রাখতে না পেরে সালমাকে জিজ্ঞেসই করে ফেললো লিলিয়ান। আপা, এতো অনেক টাকার ব্যাপার! এত টাকা কীভাবে জোগাড় করবেন? সালমা বলল, তারা ভাইবোনেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সবাই মিলে মায়ের চিকিৎসার ব্যয় সমানভাবে বহন করবে। কথাটা শুনে লিলিয়ানের খুব ভালো লাগলো এবং চিন্তা করতে লাগলো সালমাকে কীভাবে সাহায্য করা যায়? কারণ লিলিয়ান জানে সালমা ও তার স্বামীর যে আয় তাতে মাস কাভার হয়না। টানাটানি লেগেই থাকে। তাই লিলিয়ান সিদ্ধান্ত নিলো সালমাকে কিছু টাকা দিবে তার মায়ের চিকিৎসার জন্য। যদিও টাকাটা ম্যানেজ করতে লিলিয়ানেরও কষ্ট হবে। কারণ অনলাইন বিজনেস করে যে টাকা আয় হয় তা দিয়ে সে শুধু নিজেই চলতে পারে এবং মেয়েদের ছোটখাটো চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে, এখান থেকে অন্যকে সাহায্য করার মতো টাকা বের করা কষ্টসাধ্য! কিন্তু তবুও লিলিয়ানের মন চাইছে সালমাকে সাহায্য করার জন্য।

পরের দিন সালমা আসলে পর লিলিয়ান তাকে দুই হাজার টাকা দেয় এবং বলে এ টাকা আপনার মায়ের চিকিৎসার জন্য। টাকাটা পেয়ে সালমা মহাখুশি! এরপর রাতের বেলা লিলিয়ান যখন নেটে বসে অনলাইন বিজনেসের কাজ করছিল তখন হঠাৎ করেই একটি অফিস থেকে খাবারের একটা বড় অর্ডার পেয়ে যায়। ১০০জনের দুপুরের খাবারের অর্ডার! লিলিয়ান খুশিতে টগবগ করছিল! বুঝতে বাকী রইলো না প্রকৃতির নিয়ম! মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালো এভাবে দানশীলতার প্রতিদান দেওয়ার জন্য॥

ফাদার সুনীল রোজারিও

সিনোডাল চার্চ নিয়ে নানাভাবে, আলোচনা, সেমিনার কম হয়নি। গত প্রায় দুই বছর ধরে বাংলাদেশের কাথলিক চার্চে বিষয়টি নিয়ে ছিলো কমন আলোচনা- মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ, অন্য কথায় একসঙ্গে যাত্রা। এই যাত্রায় প্রকৃতির অন্য কোনো প্রাণি বা বস্তুকে সহযাত্রী হিসেবে গণ্য করার আগে মানব জগতের বিষয়টি প্রথমে আসে। কারণ সৃষ্টির মঞ্চে মানব সন্তান হলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তাই চার্চের পালকীয় জীবনের মূল লক্ষ্য হলো মানব সন্তান। কিন্তু প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রকৃতিকে লালন-পালন করার দায়িত্ব ঈশ্বর মানব সন্তানের কাঁধে ন্যস্ত করেছেন। তাই সিনোডাল চার্চের এই যাত্রাপথ প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে নয়- প্রকৃতির মধ্যেই আয়োজন করতে হবে উৎসবগুলো- প্রকৃতিকে রক্ষা করে।

সিনোডাল মণ্ডলি এমন একটি চলমান পদ্ধতি, যার মধ্যদিয়ে বিশপগণ যাজকদের নিয়ে আত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খ্রিস্টভক্তগণের সঙ্গে সহযোগিতার লক্ষ্যে খোলাখুলি আলোচনা করেন। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "একই ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে একসঙ্গে যাত্রা, যেনো মণ্ডলী যে ঈশ্বরের দান, সে বিষয়ে সবাই মিলেমিশে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।" সিনোড বিশপদের ধর্মসভা হলেও পোপ সিনোডালিটি বলতে গিয়ে জোর দিয়েছেন "ভক্তসমাজ"কে। তিনি বলেছেন, "সিনোড কোনো সংসদ নয়, মতামত অনুসন্ধান করাও নয় কিন্তু "ভক্তসমাজ"- যার প্রাণ হলেন পবিত্র-আত্মা।" এই পবিত্র আত্মা যেনো মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় সেই জন্য এই সহযাত্রা, লেনদেন ও সহভাগিতা। যেনো এর মধ্যদিয়ে ভক্তগণ ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করতে পারে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পারে, যিশুর শিক্ষা হলো, "আত্মিক শক্তি ও জীবন।" ফলে ভক্তগণের মধ্যে যেনো সঞ্চারিত হয় "প্রেরণ দায়িত্ব"। এই বিষয়ে সু-সংবাদ লেখক যোহন বলেন, "আত্মিক শক্তিই জীবন সঞ্চারী শক্তি ... আমি যেসব কথা তোমাদের বললাম, সেসব কথাই তো আত্মিক শক্তি ও জীবন সঞ্চারী" (৬:৬৩)। সিনোডাল চার্চের দাবি হলো, ভক্তসমাজের মধ্যে আত্মিক ও জীবন সঞ্চারী শক্তি জাগ্রত করা- যেনো তারা বাণী প্রচারে আগ্রহী হয়ে ওঠে- যেনো মণ্ডলীর হয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করতে পারে।

কানাডার কার্ডিনাল মিশেল সিজেরনি বলেছেন, "Synodality is the way for Integral Human Development" অর্থাৎ সিনোডালিটি হলো, "সমন্বিত মানব উন্নয়ন" পথে যাত্রা। সমন্বিত মানব উন্নয়ন অর্থ- অন্তঃব্যক্তিক উন্নয়ন। পোপ ৬ষ্ঠ পৌল থেকে শুরু আজ পর্যন্ত সব পোপ এবং চার্চের বিধায়কগণ সমন্বিত মানব উন্নয়ন নিয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সমন্বিত মানব উন্নয়ন মানে নয় শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনীতি, প্রতিপত্তি বা আধুনিক সভ্যতা। এই প্রসঙ্গে কার্ডিনাল বলেন, "Synodality offers is a valid way forward to promote the God-given human dignity of all people." যার মানে হলো, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের দেওয়া মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সিনোডের একটি বৈধ আহ্বান। মানুষ, প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক বিভাজনের কারণে তার পাওনা মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। "মানব উন্নয়ন" প্রৈরিতিক পত্রে পোপ ৬ষ্ঠ পৌল বলেছেন, "উন্নয়ন নিছক অর্থনৈতিক উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যথার্থতার জন্য উন্নয়নকে হতে হবে পূর্ণাঙ্গ: যেটা হলো সমন্বিত- যেটা প্রত্যেক ব্যক্তির ও পুরো ব্যক্তির মধ্যে উত্তম অগ্রগতি সাধন করে।"

"সমন্বিত মানব উন্নয়ন" নিয়ে সিনোডাল মণ্ডলী কী বলতে চায়? The Church's commitment to promoting integral human development. সিনোডাল চার্চ বলতে চায় যে, মণ্ডলীর দায়িত্ব হলো সমন্বিত মানব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করা। ভাটিকানের বিধায়ক মন্সিনিয়র লুসিও রুইজ বলেন, "Involves observing contemporary culture, being connected to contemporary men and women, and wanting to communicate the Lord's Message with their language in the places where they live"। সমকালীন সংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ করা ও সমকালীন সময়ের নারী-পুরুষ হিসেবে, মানুষ যেখানে যে ভাষা-সংস্কৃতিতে বসবাস করে তাদের সঙ্গে সেভাবে প্রভুর বার্তা দিয়ে যোগাযোগ করা। এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে- নতুন উপায়ে পালকীয় কাজের জন্য পরিবর্তনশীল যুগ-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করাকে। আর একটি বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, আর তা হলো, "To enter into this dynamic of mutual listening, accompaniment and mutual service", অর্থাৎ প্রাণবন্তভাবে পারস্পরিক শ্রবণ, সহযাত্রা এবং পারস্পরিক সেবা। সিনোডাল চার্চ নিয়ে আমরা যতোই আলোচনা করি না কেনো- প্রাথমিক লক্ষ্য হলো প্রকৃত খ্রিস্টভক্ত হয়ে ওঠা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে- গত দু'বছরের আলোচনা, সভা সেমিনার, কর্মশালার মধ্যদিয়ে এই সমন্বিত মানব উন্নয়ন কতোটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- তা মূল্যায়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। বহুমুখী আলোচনার পর চার্চের পালকীয় জীবন ও ভক্তগণের জীবনে কতোটুক পরিবর্তন এসেছে- এমন একটা প্রশ্ন সামনে আসে। ফলে সমন্বিত মানব উন্নয়ন কতো ধাপ এগিয়েছে। সমন্বিত মানব উন্নয়ন প্রশ্নে যে ক্ষেত্রগুলো বিবেচনায় আনতে হবে সেগুলো হলো- ভক্তগণের মধ্যে পারস্পরিক খ্রিস্টীয় সামাজিক জীবন, আদর্শ পরিবার গঠন, "আমার ধর্মপল্লী আমার দায়িত্ব" এই বিষয়ে জনগণের উপলব্ধি কতোদূর এগিয়েছে, ধর্মের প্রতি যাদের অনীহা- তাদের মধ্যে কতোভাগ ধর্মমুখী হয়েছে, সাক্রামেন্তীয় জীবন কতো মজবুত হয়েছে, অন্যের সঙ্গে সংলাপ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, অন্যকে হৃদয়ের কান দিয়ে শ্রবণ করা, দরিদ্রদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেওয়া, ইত্যাদি, বিষয়গুলো যখন একজন ব্যক্তির পুরো সত্ত্বাকে অনুপ্রাণিত ক'রে পরিবর্তন করে- সেটাকে বলতে পারি, সমন্বিত মানব উন্নয়ন।

সমন্বিত মানব উন্নয়ন শুধু কিছুদিনের জন্য সিনোডাল মণ্ডলীর দাবি নয়- এটা মণ্ডলীর জীবন, খ্রিস্টভক্তগণের জীবন। এই সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়টি শুধুমাত্র সিনোডাল চার্চের আলোচনার বিষয় নয়- এটা মণ্ডলির একটা দীর্ঘমেয়াদি এ্যাজেন্ডা, মণ্ডলীর প্রধান পালকীয় কাজ। সিনোডালিটি নিয়ে বিশপদের সিনোড সভা আগামী বছর অক্টোবরে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যাবার কথা নয় সিনোডাল চার্চ আন্দোলন। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেখানে খ্রিস্টমণ্ডলি ছোটো একটি সমাজ- সেখানে একসঙ্গে যাত্রা বা সহযাত্রা ভক্তসমাজের মধ্যে নিরাপত্তা, উৎসাহ বাড়াবে। তার আগে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই তৃণমূল পর্যায়ে পরিবর্তন আনার জন্য আগামীদিনের সিনোডাল চার্চ নিয়ে টেকসই পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। যে পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হবে মানব সমাজকে ঘিরে। কার্ডিনাল মিশেল সিজেরনি যেটাকে বলেছেন, "Integral Human Development" অর্থাৎ, "সমন্বিত মানব উন্নয়ন"। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা॥

সাধু জন মাকাউশে
গরীবের বন্ধু সাধু, সেপ্টেম্বর ১৭

খুবই একটি সাধারণ পরিবেশে এবং সাধারণ গরীব পরিবারে জনের জন্ম হয়। পরবর্তী জীবনে তাঁকে যে দরিদ্রতা ও নম্রতার মধ্যে কাটাতে হবে তাঁর জন্মই সেই বারতা ঘোষণা করে। খুব অল্প বয়সেই তিনি অনাথ হয়ে পড়েন। সব হারিয়ে কাকার আশ্রয়ে তিনি বড় হতে থাকেন। কাকা যে তাঁকে খুব বেশী যত্ন করতেন তা কিন্তু নয়। বলা যায় জনের ব্যাপারে কাকা খুবই অযত্নশীল ছিলেন। কারণ জনের কাকা নিজেও খুব গরীব ছিলেন। ভাইপো জনের শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি অনেক অবহেলা করেছেন। যে বয়সে একজন কিশোর বালকের স্কুলে বসে লেখাপড়া করার কথা জনকে সেখানে স্পেনের এক ছোট গ্রামে এসে তৃণভূমিতে মেষদের চরিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। মেষদের পরিচর্যা করার সময় হাতে জপমালা নিয়ে মালা প্রার্থনা করতেন। জন ছিলেন তাঁর আপন ভুবনে। তাঁর বয়স যদিও বিশ বৎসর তবু জগতে কি ঘটছে, তাঁর আশেপাশে কি হচ্ছে এসব বিষয়েই তিনি অজ্ঞ ছিলেন। এই সময় ইউরোপে মাণ্ডলিক কিছু বিষয় নিয়ে যে বিতর্ক চলছে বা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টানরা যে নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে জন সেসব বিষয়ে কিছুই জানতেন না। কিন্তু ঈশ্বর এবং ঈশ্বরজননী কুমারী মারীয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কারণে তিনি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করেন।

তিনি একটি অলৌকিক দর্শন পান এবং এই দর্শন লাভের মধ্য দিয়ে তিনি ধর্মীয় জীবনের ডাক শুনতে পান। দর্শনে মঙ্গলসমাচার লেখক যোহন তাঁকে দেখা দেন এবং এই দর্শনে তাঁকে লাতিন আমেরিকায় যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁকে জানানো হয় সেখানে একটি আশ্রমে তিনি থাকতে পারবেন এবং গরীব ও নির্যাতিতদের সেবা দিতে পারবেন। কোনরূপ দ্বিধা ছাড়াই তিনি দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দেন।

এখানে এসে তিনি দমেনিকান আশ্রমে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই মঠে প্রবেশ করে তিনি মার্টিন দ্য পোরেসের দেখা পান। পরবর্তীতে মার্টিন হয়ে ওঠেন তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু।

এখানে জন প্রার্থনা করার উপযোগী ও সহায়ক পরিবেশ পান। পবিত্রতা লাভ করার জন্য সাধারণ ব্রাদারগণ তাঁর জন্য যে সমস্ত অনুশীলন ও ব্যবস্থাপত্র দেন সেগুলি তিনি নিষ্ঠার সাথে চালিয়ে যান এবং এসবের সাথে জপমালা প্রার্থনা আবৃত্তি যোগ করেন। অন্যান্য সকল কাজ ঠিক মত সম্পন্ন করেও তিনি কখনও কখনও ৪৫ বেত মালা প্রার্থনা করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোন অবহেলা ছিল না। তাঁর প্রার্থনা জীবন ও মারীয়ার ভক্তি আমাদের অবাক করে দেয়। তিনি প্রতিদিনকার স্বাভাবিক কাজগুলি সম্পন্ন করে বাকী সময় প্রার্থনায় কাটাতেন। কারণ তিনি মনে করতেন বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া প্রয়োজন ঠিক একইভাবে আমাদের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রার্থনা খুবই দরকারী বিষয়।

এটা সত্য ও স্বাভাবিক যে গরীব অভাবী মানুষগুলোর প্রয়োজন মেটানোর সেবকাজ সহজ না। অনেক সময় অধৈর্য্যভাব আসতে পারে। কিন্তু জনের বেলায় সেটা সত্য ছিল না। গরীব-দুঃখীদের সেবা কাজে তিনি সব সময়ই উদার, নম্র ও ধীরস্থির থাকতেন। যারা তাঁকে ভাল করে জানতেন তারা তাঁর সম্পর্কে এই কথাটা প্রায়ই বলতেন, "জন সবসময়ই অনেক নম্র হয়ে গরীব-দুঃখীদের সেবা-যত্ন করতেন।" গরীবদের সেবাকাজটাকে তিনি সব সময় একটা চরম ও পরম দায়িত্ব হিসাবেই দেখতেন। তাঁর কাছে প্রতিদিন প্রায় ২০০ জন গরীব ও বিভিন্ন রোগে অসুস্থ মানুষ সাহায্যের আশায় আসতেন। তিনি অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে তাদের কথা শুনতেন, তাদের সেবা দিতেন। কাউকে তিনি শুন্য হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। আমরা নিজেদের বিষয়ে একটু কল্পনা করে দেখতে পারি এতো সংখ্যায় লোক যদি আমাদের কাছে প্রতিদিন আসতেন আমরা কি আমাদের ধৈর্য ধরে রাখতে বা বিরক্ত না হয়ে থাকতে পারতাম? হয়তো দায়িত্ব থাকার কারণে আমরা কোন উপায় না দেখে তা পালন করতে বাধ্য হতাম। কিন্তু জন তা করেছেন ভালোবাসার কারণেই।

গরীবদের যেন তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করতে পারেন সেজন্য তিনি একটা কৌশল অবলম্বন করতেন। কৌশলটি হলো– তাঁর গাধাটি নিয়ে তিনি ভাল অবস্থাপন্ন পরিবারগুলোতে বেরিয়ে পড়তেন। তবে কোন কোন সময় মঠের ভিতরে তাঁর দায়িত্ব থাকার কারণে দান সংগ্রহে যেতে পারতেন না। সে কারণে তাঁর গাধাটিকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যেন সে নিজেই এই দান সংগ্রহের কাজটি করতে পারেন। একটি পশুকে এভাবে গরীবদের জন্য কাজ করতে দেখে লোকেরা অবাক হয়ে যেতেন এবং মনে মনে ভাবতেন একটি গাধা এমন কাজ এত সুন্দরভাবে করতে পারে? সকলেই জানতেন গাধাটি কার জন্য দান সংগ্রহ করছে। তারা জানতেন গাধার সংগ্রহিত এই দান থেকে কেউ কোন কিছু চুরি করবে না।

জন শুধুমাত্র গরীবদের জাগতিক জিনিস দিয়ে সাহায্য করতেন না বরং তাদের আত্মাদেরও যত্ন নিতেন ও পরিচর্যা করতেন। পিতা হিসাবে ঈশ্বর আমাদেরকে কিভাবে ভালোবাসেন এবং ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদের যে মূল্য ও মর্যাদা সেই সমস্ত বিষয়ে তিনি লোকদের শিক্ষা দিতেন। কি ভাবে ভাল ও অর্থপূর্ণভাবে মালা প্রার্থনা করতে হয় তিনি তাদেরকে সেসব বিষয়েও শিক্ষা দিতেন। কারণ মালা প্রার্থনা হলো মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার গল্প।

জনের বয়স যখন ষাট বৎসর ঈশ্বর তাঁর পরম বিশ্রামে তাঁকে নিয়ে যান। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে তাঁর চারপাশে যারা ছিলেন তারা তাদের নিজের কানে তাঁকে বলতে শুনলেন, "আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট এখানে আছেন এবং যিশুর মা মারীয়াও আছেন, সাধু যোসেফ, মঙ্গলসমাচার লেখক সাধু যোহন এবং অন্যান্য সাধু-সাধ্বীগণও আছেন।" ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ধন্য পোপ ষোড়শ গ্রেগরী কতৃর্ক তিনি ধন্যশ্রেণীভুক্ত হন এবং ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি পোপ ষষ্ঠ পল কতৃর্ক সাধু শ্রেণীভুক্ত হন।

তিনি ধন্য ও সাধু শ্রেণীভুক্ত হওয়ার বহু আগে থেকেই অনেক মানুষ অনুরাগ বশবর্তী হয়ে তাঁর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করে অনেক ফল পেয়েছেন। তাঁর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করে কিছু নির্দিষ্ট অনুগ্রহের জন্য তাঁর কাছে উপস্থাপন করতেন। তাদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এইসব অনুগ্রহ তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে নিয়ে দিতে পারবেন।

জনের কাছে প্রার্থনা করে অনেকের মন পরিবর্তন হয়েছে। অনেকে সুস্থ হয়েছেন। তাঁর কাছে অন্যান্য বিভিন্ন অনুনয় প্রার্থনা করে মানুষ ফল পেয়েছেন।

তিনি যেসব অলৌকিক কাজ করেছেন সেই সমস্ত আশ্চর্য ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো "অন্ন বিষয়ক" অলৌকিক কাজটি। স্থানটি ছিল অলিভেনজা, এ্যাস্ট্রেমাদুরা। এই আশ্চর্যকাজটি সাধিত হয় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি। এখানকার পাল-পুরোহিত খুব ভাল ছিলেন। তিনি প্রতি রোববার গরীবদের মাঝে খাবার বিতরণ করতেন। ধনী পরিবারগুলো থেকে সাধারণত: খাবারগুলো আসত। বিশ্বস্ত ও ভাল একজন বাবুর্চী দিয়ে খাবারগুলো ফাদার বাড়ীতেই রান্না করা হতো। কোন এক রোববার দেখা গেল যারা খাবার পাবার আশায় সেখানে জড় হয়েছেন সেই উপস্থিত জনতার জন্য যথেষ্ট খাবার নেই। বাবুর্চী যখন খাবার রান্না শুরু করবেন দেখতে পেলেন চাউলের পরিমাণ কম। বাবুর্চী তখন চাউলগুলো আগুনের পাত্রে দিয়ে বিড় বিড় করে এই বুলি আওড়ালেন, "ধন্য, গরীবদের জন্য যথেষ্ট খাবার নেই।" এ্যাসট্রেমাদুরার লোকদের জন্য "ধন্য" শব্দটি যখন উচ্চারণ করা হয় মাত্র জন মাকাউসের জন্যই ব্যবহার করা হয়। কারণ তাঁকে তারা তাদের রক্ষাকারী বন্ধু হিসাবেই মানেন এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকেন। ভাত চড়িয়ে কিছু সময়ের জন্য বাবুর্চী একটু বাইরে যান এবং ফিরে এসে দেখেন ভাতের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। বাবুর্চী তখন অবাক হতভম্ব হয়ে যান। তিনি তখন পুরোহিতের মাকে ডাকতে যান। তিনি যেহেতু বৃদ্ধা ছিলেন তাই তার আসতে দেরী হয়। ইতিমধ্যে আরেকটি পাত্র এনে অতিরিক্ত ভাত সেখানে রাখা হয়। এই ঘটনা যখন মিশনের ফাদার জানতে পারেন তিনিও তখন তাড়াতাড়ি মিশনে এসে আরেকটি পাত্রে অতিরিক্ত ভাতগুলো রাখেন। তারা নিজেরাও বলতে পারবেন না কতগুলো পাত্র তারা ভাত দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন। তারা শুধুমাত্র এটুকুই জানতেন সেদিন যারাই এসেছিলেন সবাইকে তারা পেট ভরে খাইয়েছিলেন। যে যতই চেয়েছে তত পরিমাণ খাবারই তারা যোগান দিতে পেরেছেন। খবরটি তখন তাড়াতাড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লোকদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে এটি একটি আশ্চর্যকাজ যা জন মাকাউস সম্পাদন করেছেন। কারণ তিনি গরীবদের অনেক ভালবাসতেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাদের কখনও ফিরে যেতে দিতেন না। মানুষ যখন তাঁর উপর আস্থা রেখে কিছু চাইতেন তিনি তাদের তা দিতেন॥

আলোচিত সংবাদ

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ'র ঢাকা সফর

গত ১০ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে বাংলাদেশে দুইদিনের সফর করেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফরাসি প্রেসিডেন্টকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী এ সময় ফরাসী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ২০-২৪ ফেব্রুয়ারি সাবেক ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁর বাংলাদেশ সফরের পর এটি বাংলাদেশে কোন ফরাসি প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় সফর।

ঢাকা ও প্যারিসের মধ্যে দুটি সমঝোতা স্মারক সই

অবকাঠামো, স্যাটেলাইটসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে এ সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। সমঝোতা স্মারক দুটি হলো

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এবং ফ্রান্সের, ফ্রান্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (এফডিএ) মধ্যে 'ইমপ্রুভিং আরবান গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোগ্রাম' বিষয়ে একটি ক্রেডিট-সুবিধা চুক্তি।

২. বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) এবং ফ্রান্সের এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস এসএএসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু-২ আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম-সম্পর্কিত সহযোগিতার বিষয়ে লেটার অব ইনটেন্ট (এলওআই)।

১১ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা ২০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এরপর দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র অন্বেষণে আলোচনা করেন তারা।

এদিন সকালে ঢাকা সফরের দ্বিতীয় দিনে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সকালে সেখানে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা ও তার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি।

রাতে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, জলের গানের গীতিকার ও বাদক রাহুল আনন্দের বাসায় যান। সেখানে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় কাটান এবং 'জলের গানে'র স্টুডিও ঘুরে দেখেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেন, বৈঠকে বাংলাদেশ ও ফ্রান্স জলবায়ু পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রিত অভিবাসনের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা ছাড়াও, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকালে গণভবনে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ১৭ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন তার রুশ প্রতিপক্ষকে স্বাগত জানান। ঢাকায় রাশিয়ার দূতাবাস জানিয়েছে, দুই দেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মতামত বিনিময় করবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ল্যাভরভ বলেন, তারা রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়েও আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেন, তারা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে অব্যাহত আলোচনাকে সমর্থন করেন।

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প-রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিষয়েও কথা বলেন এবং এর ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন।

মোমেন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতার জন্য রাশিয়াকে ধন্যবাদ জানান।

রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব

কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি-ইউএনডিপির দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক কেনি উইগনারাজার নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল। সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে প্রতিনিধি দলটি উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পৌঁছায়।

শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কার্যালয়ের অতিরিক্ত কমিশনার শামসুদ দৌজা নয়ন জানিয়েছেন, জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব কেনি উইগনারাজার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি উখিয়া ক্যাম্প ১৭, ক্যাম্প ২০ বর্ধিত অংশ, ক্যাম্প ৪ এবং কুতুপালং রেজিস্ট্রার ক্যাম্প পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ সফর করলেন যুক্তরাজ্যের পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি

যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ এবং ডেভেলপমেন্ট (এফসিডিও) অফিসের পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি স্যার ফিলিপ বার্টন সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

সূত্র জানিয়েছে, এই সফরে স্যার ফিলিপের প্রধান লক্ষ্য হবে পঞ্চম যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ কৌশলগত সংলাপ, যাতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন সভাপতিত্ব করেন। এই সংলাপে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক; অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক অংশীদারিত্ব; এবং রোহিঙ্গা সংকট সহ অন্যান্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয় আলোচনা করা হয়। সেই সাথে এই সংলাপ দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং কপ২৮ (COP28) ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং যুক্তরাজ্যের শক্তিশালী অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিনিয়োগ প্রস্তাব তুলে ধরবে।

দুই দিনের সফরে ঢাকায় জাপানের বাণিজ্যমন্ত্রী নিশিমুরা ইয়াসুতাশি

জুলাই ২৩, ২০২৩

জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করতে, জাপানের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী নিশিমুরা ইয়াসুতোশি দুই দিন ঢাকা সফর করেছেন। (২৩ জুলাই) বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় শাখার মহাপরিচালক তৌফিক হাসান। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি উপস্থিত ছিলেন।

সফরকালে "আগামী ৫০ বছরের জন্য বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক সম্পর্ক" শীর্ষক একটি সম্মেলনে যোগ দেন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও এফবিসিসিআই-এর যৌথ সহযোগিতায় ঢাকায় এ সম্মেলনের আয়োজন করে জেট্রো।

দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে প্রস্তাবিত ইপিএ স্বাক্ষরের বিষয়ে একটি যৌথ সমীক্ষার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্পর্ক বাড়াতে ঢাকায় ব্রিটিশ মন্ত্রী

৫ জুলাই যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবিষয়ক মন্ত্রী নাইজেল হাডলস্টন এমপি বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে ৪ জুলাই মঙ্গলবার রাতে তিনি ঢাকায় আসেন। বুধবার (৫ জুলাই) ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উভয় দেশের অর্থনীতি বিকাশের লক্ষ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক তৈরিতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তরাজ্য। মন্ত্রী হাডলস্টন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এমপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও মে মাসে বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্যের মধ্যে স্বাক্ষরিত এভিয়েশন ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট পার্টনারশিপ নিয়ে আলোচনা করেন। এটি বাংলাদেশের বিমান চলাচল খাতকে শক্তিশালী এবং উভয় দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

জাতিসংঘের উপ মহাসচিবের বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রকল্প পরিদর্শন

জাতিসংঘের উপ-মহাসচিব এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন গ্রুপের প্রধান আমিনা জে মোহাম্মদ ২ জুলাই বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বাগেরহাট জেলার মংলা সফর করেন। জলবায়ু অভিযোজনে স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সহনশীলতা সৃষ্টিতে জাতিসংঘ কিভাবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করছে তা পর্যবেক্ষণই ছিল এই সফরের মূল উদ্দেশ্য।

সফরকালীন তিনি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন সরকার, ইউএনডিপি এবং ইউএনসিডিএফ কর্তৃক যৌথ ভাবে গৃহীত 'লোকাল গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (লজিক)' প্রকল্প পরিদর্শন করেন। প্রকল্পটি স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থায়ন ও জলবায়ু অভিযোজনে উদ্যোগ গ্রহণ এবং সহনশীলতা সৃষ্টিতে কাজ করে থাকে।

ঢাকায় ভারতের সেনাপ্রধান মনোজ পান্ডে

৫ ও ৬ জুন ভারতের সেনাপ্রধান মনোজ পান্ডে বাংলাদেশ সফর করেন।

এদিকে মনোজ পান্ডের বাংলাদেশ সফরের ঘোষণা দেওয়া ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিটি প্রকাশ করে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। সফরকালে সেনাপ্রধান বাংলাদেশের শীর্ষ সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে তিনি বাংলাদেশ-ভারত প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও সফরের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার জেনারেল মনোজ পান্ডে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে (বিএমএ) ৮৪তম লং কোর্সের অফিসার ক্যাডেটদের পাসিং আউট প্যারেড (পিওপি) পরিদর্শন করেন।

পাঁচ মাসে চীনের তিন উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধির ঢাকা সফর

২৪ মে ২০২৩

চীনের ভাইস মিনিস্টার সুন ওয়েইডং দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসছেন। সুন ওয়েইডংয়ের এই সফর হয় চলতি বছর চীন থেকে ঢাকায় বেইজিংয়ের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের তৃতীয় সফর। সুন ওয়েইডংয়ের সফরে দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক পরিসরে দ্বিপক্ষীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, মূলত পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার কথা। বিশেষ করে ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতার পাশাপাশি চীনের বৈশ্বিক উন্নয়ন উদ্যোগে (গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভড় জিডিআই) বাংলাদেশের যুক্ততার বিষয়ে আলোচনা হয়। দ্বিপক্ষীয় এসব বিষয়ের পাশাপাশি চীনের উদ্যোগে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে ঘিরে পরিস্থিতি নিয়েও দুই দেশের পররাষ্ট্রসচিবরা আলোচনা করেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এপ্রিল মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ওয়াশিংটন যাওয়ার ঠিক এক দিন আগে ঢাকায় এসেছিলেন মিয়ানমারবিষয়ক চীনের বিশেষ দূত দেং সিজুন। ওই সময় তিনি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরুর বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এবং পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে আলোচনা করেন। চীনের বিশেষ দূতের ওই সফরের ধারাবাহিকতায় পরে এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধে পাইলট প্রকল্পের আওতায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু নিয়ে চীন, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করেছিল। ওই বৈঠকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলেও ঘূর্ণিঝড় মোখার কারণে আপাতত তা পিছিয়ে গেছে

ঢাকায় কানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন মন্ত্রী

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

চারদিনের ঢাকা সফর করেছেন কানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন মন্ত্রী হারজিত এস. সাজ্জান। (২৩ ফেব্রুয়ারি) রাতে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। এসময় তাকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন।

এই সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন হারজিত।

সফরকালে তিনি রোহিঙ্গা ক্যাম্প সফর, সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঢাকা ও কক্সবাজারে মতবিনিময় করেন।

এছাড়া কানাডার আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত কয়েকটি প্রকল্পও পরিদর্শন করেন।

বেলজিয়ামের রানি মাথিল্ডে ঢাকায়

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসেন বেলজিয়ামের রানি মাথিল্ডে। ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রানিকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) দূত হিসেবে রানি মাথিল্ডের এ সফর।

এসডিজি দূত হিসেবে রানি মাথিল্ডে মেয়েদের শিক্ষা, নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বাংলাদেশের অর্জন এবং এসব ক্ষেত্রে সহায়তার দিকগুলো দেখেন।

রানি মাথিল্ডে কক্সবাজারের কুতুপালংয়ে রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির পরিদর্শন করেন। এটি এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় আশ্রয়কেন্দ্র।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, বেলজিয়ামের রানি বাংলাদেশ সফরে সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ঢাকায় মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

দুই দিনের সফরে (১৪ জানুয়ারি) ঢাকা সফর করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু।

সফরকালে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এছাড়া সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মানবাধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠক করেন তিনি।

বাংলাদেশ সফরকালে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং শ্রম ও মানবাধিকারের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি জানতে উর্ধ্বতন বাংলাদেশি কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছেন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী লু॥

তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, নয়া দিগন্ত, সময়, ডেইলি স্টার বাংলা

বিজ্ঞ/২৬১/২৩

আকাশচুম্বী আকাঙ্খা

সংগ্রামী মানব

রনিত ও জেসমিন ভাইবোন। তাদের বাড়ি সুখপাড়া নামক একটি গ্রামে। বাবা বছর কয়েক আগে পরলোকগত হয়েছেন। পয়তাল্লিশর্ধ্ব মাকে নিয়ে তাদের বসবাস। একদিন রনিত ও জেসমিন গ্রামের মেঠো পথ ধরে হাঁটতে বেরিয়েছে। অভাব-অনটনে তাদের মানবেতর জীবনের কথা দুজনাই সহভাগিতা করছে। রনিত বলে, জেসমিন, কেনই বা আমাদের এতো অভাব, এতো দুঃখ-কষ্ট। জেসমিন উত্তরে বলল, কী আর বলল ভাই সবই আমাদের কপাল। কারও জীবনে সুখ আর কারও জীবনে দুঃখ থাকে এটাই প্রকৃত নিয়ম। এক পর্যায় রনিত বলল, অনেকেই তো বিভিন্ন আশ্চর্য কিছুর সাক্ষী হয়। কেন আমরা কোন আশ্চর্য কিছু দেখি না? দেব, দেবতা, পরী, জলকন্যা কেন আমাদের দেখা দেয় না? জেসমিন উত্তরে বলল, তা কি করে বলল ভাই। সবই ভাগ্যেও পরিহাস। এককথায় রনিত একটু লোভী প্রকৃতির ছিল। তারা সামনের দিকে এগোতে লাগল। হঠাৎই তারা দেখতে পেল দুটি স্থান আশ্চর্যভাবে জ্বলছে। রনিত বলল, চল্ বোন এগিয়ে গিয়ে দেখি। তারা দেখতে পেল একটি স্থানে রয়েছে জাগতিক ভোগ-বিলাসিতা। আর একটি স্থানে রয়েছে জ্ঞান ও ভালোবাসা। রনিত বলল, বোন আমরা তো আশ্চর্য কিছু দেখতে চেয়েছিলাম আজ তা দেখতে পেয়েছি। তাই চল্ আমরা জাগতিক ভোগ-বিলাসিতাকে বেঁছে নিই। জেসমিন উত্তরে বলল, না ভাই আমি জাগতিক ভোগ বিলাসিতা চাই না বরং আমার প্রয়োজন জ্ঞান ও ভালোবাসা। তাই আমি জ্ঞান ও ভালোবাসা নিব। তদুপরী রনিত জাগতিক ভোগ-বিলাসিতাকেই বেছে নিল আর জেসমিন বেছে নিল জ্ঞান ও ভালোবাসা। তারা পরক্ষণে বাড়ির উদ্দেশে হাঁটতে লাগল। পথোমধ্যে রনিত অক্কা পেল। আর জেসমিন ভাইকে হারিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল। তখন সে তার জ্ঞান ও ভালোবাসা দিয়ে সকলের মন জয় করে নিল। অল্প সময়ের মধ্যে সে প্রতিষ্ঠিত হল ও তার সকল স্বপ্ন পূরণ হল।

প্রিয় ভাই-বোনেরা জাগতিক ভোগ-বিলাসিতার মায়াজ্বালে পরে আমরা নিহত হই আর জীবিত থাকি জ্ঞানে ও ভালোবাসায়॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

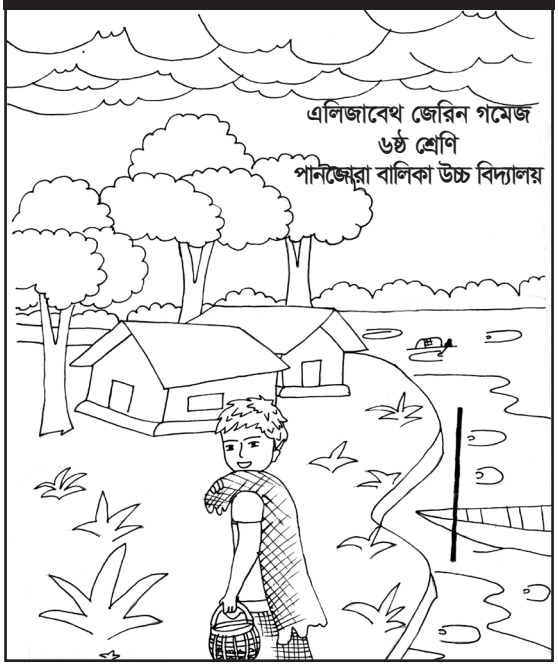

এলিজাবেথ জেরিন গমেজ
৬ষ্ঠ শ্রেণি
পানজোরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

বর্ষাকাল

অদ্রি রোজারিও
৬ষ্ঠ শ্রেণি

বর্ষা আসে বৃষ্টির ধারায়
কালো মেঘের ভেলায়
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে
দেখে মন যায় ভরে।

বৃষ্টি পড়ে টিনের চালে
মধুর শব্দে মন যে দোলে

চারিদিকে ব্যাঙের ডাকে
প্রকৃতি আজ আনন্দে জাগে
নতুন পানির আগমনে
মাছেরা সব ছুটাছুটি করে।

বর্ষাকাল অতি মজার
সারাদিন ভরে
কাঁটবো সাঁতার॥

আমরা এখন যন্ত্রমানব

ক্ষুদীরাম দাস

আমরা এখন যন্ত্রমানব
নির্ঘুম এই সময়গুলোতে যেন
রাতজাগা নিয়তি যেন পাহাড় ঘেরা
এক ঘরে বসে আছি যন্ত্রমানব হয়ে।

আমরা এখন যন্ত্রমানব
আমাদের কোনো আবেগ থাকতে নেই
থাকতে নেই কোন অনুভূতি
চারিদিকে যেন নিষ্ঠুরতা
নির্বাক যন্ত্রমানবের দীর্ঘশ্বাস
কেউ বুঝে না;
অথবা ক্লান্তিহীন ছুটে চলা সুখের
মিথ্যে আশায়।

নিষ্ঠুর সব যন্ত্রমানবের পরশে
পরিণত হয়েছি মোরা অনুভূতিহীন মানবে
দুঃখ, জরা পিছু ছাড়ছে না
সময় এখন
কঠিন ও রূঢ় এক বাস্তবে;
আমরা এখন যন্ত্রমানব।

সিস্টার মেরী বার্তার স্মরণে (এসএমআরএ)

ঝিনু মারীয়া পালমা

আমার প্রিয় সিস্টার মেরী বার্তা,
মধু মাখা ছিল তাঁর কথা বার্তা।
স্বভাব ছিল নম্র, ভদ্র, ও শান্তশিষ্ট,
এটাই তাঁর একমাত্র ব্যক্তিত্ব।
সেবার কাজে নিয়েছে ব্রত,
কর্তব্য পালন করতেন ঠিক ঠিক মত।
(মথুরাপুর) কাতুলী গ্রামে মিটিং
করতে আসতেন,
সময় হলেই ভগ্নিগণ শুধু
তাকেই খুঁজতেন।
খ্রিস্টের বাণী প্রচার করতেন
মোদের মাঝে,
এখন শুধু তাঁরই কথা অন্তরে বাজে।
শুনলাম যখন তিনি আর এ জগতে নাই,
মনে তখন বড়ই ব্যাথা পাই।
পরপারে পারি জমালেন যিনি,
তিনিই আমার প্রিয় সিস্টার মেরী
বার্তা রানী।
এখন তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করি,
এই প্রার্থনা করে, আমার কবিতা লেখা
শেষ করি॥

সনদ নং ঃ ০৪৯৭৮-০০৭১১-০০৫৫১ এমআরএ ঃ ০০০০৫৬৩

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন এবং এনজ্যিও ব্যুরো কর্তৃক রেজিষ্ট্রীকৃত। এটি বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ হিসেবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলেছে। ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ কর্তৃক পরিচালিত সঞ্চয় ও ঋণ প্রকল্পে **"ক্রেডিট অর্গানাইজার"** পদে নিয়োগের জন্য সৎ, যোগ্য ও পরিশ্রমী **নারী প্রার্থীদের** নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। পদের বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হ'লোঃ

পদের বিবরণ ও দায়িত্ব কর্তব্যসমূহ:	প্রয়োজনীয় শর্তাবলী:
- পদের নাম : **ক্রেডিট অর্গানাইজার** - কর্ম এলাকা : গ্রীণরোড ও মিরপুর কর্ম এলাকা - বয়স : ২৫ - ৩৫ বছর - অন্যান্য : শিক্ষানবীশকাল শেষ হলে সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধা সমূহ প্রদান করা হবে। **প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ:** - কর্ম এলাকায় সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র নারীদেরকে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বনের জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।	• শিক্ষাগত যোগ্যতা : কমপক্ষে বি.এ/বি.কম পাশ। • অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। **অন্যান্য শর্তাবলী:** • প্রয়োজনে অফিসের সময়ের বাইরে ও ছুটির দিনে কাজ করবার মানসিকতা থাকতে হবে। • মানুষের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে কৌশলী হতে হবে। • সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পারদর্শী হতে হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী :

- প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
- জীবন বৃত্তান্তের সাথে পরিচিত দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/টেলিফোন নম্বরসহ রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।
- সম্পূর্ণ আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদিসহ **আগামী ১৫ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে** সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা ১২০৫, এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) প্রেরন করতে হবে।
  কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য কোন প্রকার TA/DA প্রদান করা হবে না।

সাধারণ সম্পাদিকা
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫
ই-মেইলঃ dhakaywca@gmail.com

বিজ্ঞ/২৯২/২৩

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সদস্যভিত্তিক সংস্থা। এটি **১৯৬১** সাল থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী, কিশোর/যুব নারী ও শিশুর জীবনমান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশে স্বাস্থ্য সম্মত নিরাপদ বিভিন্ন ধরনের খাবার প্রস্তুত করার জন্য ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি হোম-ক্রাফট কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত প্রকল্পের জন্য আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত পদে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

পদের নাম : ক্যান্টিন কারিগর
কর্মস্থল : ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ঢাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা :

- নূন্যতম অষ্টম শ্রেণি পাশ হতে হবে।
- বেকিং, কনফেকশনারী ও ফাষ্টফুড প্রস্তুত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- রান্না ঘর এবং খাদ্য প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য বিধান সম্বন্ধে যাথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে।
- মার্জিত, রুচিশীল, শালীনতাবোধ ও আন্তরিক হতে হবে।
- অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন এবং অন্যান¨ সুবিধাদি ঃ বেতন ও ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী :

- প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১(এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
- জীবন বৃত্তান্তের সাথে পরিচিত দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/টেলিফোন নম্বরসহ রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।
- সম্পূর্ণ আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদিসহ **আগামী ১৫ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে** সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা ১২০৫, এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) প্রেরন করতে হবে।
  কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য কোন প্রকার TA/DA প্রদান করা হবে না।

সাধারণ সম্পাদিকা
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা - ১২০৫

মথুরাপুরে শিশু মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন

নয়ন ইগ্নাশিউস পালমা ▯ গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, ব্যাপি একটি বিশেষ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৯টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে উক্ত সেমিনারের শুভ সূচনা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন সহকারি পাল-পুরোহিত ফাদার উত্তম রোজারিও। উক্ত খ্রিস্টযাগে গান, বাণী পাঠ, সর্বজনীন প্রার্থনা ও মহারতী প্রদানের মধ্যদিয়ে প্রভাত তারা ও মারীয়া সংঘের সদস্যাগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন ।

মথুরাপুর সাধ্বী রীতার ধর্মপল্লীতে মহাসমারোহে শিশু মারীয়ার পর্ব পালন করা হয়। সিস্টার যুঁথিকা এসএমআরএ-এর পরিচালনায় মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে প্রভাত তারা ও মারীয়া সংঘের সকল সদস্যাগণ সারাদিন

পবিত্র খ্রিস্টযাগের শুরুতে পাল-পুরোহিত শিশু মারীয়ার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর সংঘের সকল সদস্যাগণ শিশু মারীয়ার প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা করে ধর্মপল্লীর হলরুমে প্রবেশ করেন। হলরুমে প্রবেশের পর শিশু মারীয়ার জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়। স্বাগত বক্তব্যে পাল পুরোহিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান। এরপর শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে মথুরাপুর ধর্মপল্লীর প্রতি গ্রামের মহিলা সদস্যাগণ অংশগ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু মারীয়ার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে নাচ, গান, নাটক, জারিগান ও কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে সংঘের প্রত্যেক সদস্যাগণ তাদের প্রতিভাকে তুলে ধরার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর সিস্টার যুঁথিকা এসএমআরএ সকলকে ধন্যবাদ জানান। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে সেমিনার সমাপ্ত হয়॥

“সেবা কর্মে ব্রাদার মার্সেল ড্যুসাইন সিএসসি” বই এর মোড়ক উন্মোচন

এলড্রিক বিশ্বাস ▯ গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সন্ধ্যা ৬ টায় ঢাকার সাভারে অবস্থিত ব্রাদার মার্সেল মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হল রুমে ব্রাদার মার্সেলের জীবনের স্মৃতিচারণমূলক বই “সেবা কর্মে ব্রাদার মার্সেল ড্যুসাইন, সিএসসি ” বই এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রাদার বিনয় স্টিফেন গমেজ সিএসসি। ব্রাদার বিনয় স্টিফেন গমেজ বলেন, ব্রাদার মার্সেল তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলোতে সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুলে ছিলেন। তিনি সবাইকে আন্তরিকভাবে নিয়েছিলেন। তিনি সবার কাছে বন্ধুর মত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট ব্যারিস্টার আলবার্ট বাড়ৈ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রাদার সিলভেস্টার মুধা সিএসসি, ব্রাদার যোয়াকিম গমেজ সিএসসি, এথেলবার্ট পিনেরু, ব্যারিস্টার রুয়েল লিংকন বাড়ৈ ও ব্যবসায়ী জাকির হোসেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন লেখক ও সাংবাদিক এলড্রিক বিশ্বাস। সহযোগিতায় ছিলেন সজল বাড়ৈ, সাথীরাং মারমা ও আরো অনেকে।

ব্যারিস্টার আলবার্ট বাড়ৈ বলেন, ব্রাদার মার্সেলের জন্য কিছু করতে পেরেছি এজন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি। অন্যান্য বক্তারা ব্রাদার মার্সেল ড্যুসাইন সিএসসি এর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করেন॥

ঠাকুরগাঁও ধর্মপল্লীতে সাধ্বী মাদার তেরেজার পর্ব উদযাপন

জন মুরমু ▯ ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরগাঁও ধর্মপল্লীতে অবস্থিত সাধ্বী মাদার তেরেজার কনভেন্ট মিশনারী অব চ্যারিটি এবং সেন্ট মাদার তেরেজা স্কুলে যৌথভাবে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ সেবাস্তিয়ান টুডু এবং তাকে সহযোগিতা করেন ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার প্রদীপ মারাণ্ডী, ফাদার আন্তনী সেন, ফাদার লাজারুস সরেন

এবং ফাদার মার্চেলিউশ তির্কী। বিশপ মহোদয় তার উপদেশে বলেন– সাধ্বী মাদার তেরেজা দুস্থ মানবতার সেবায় তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে রাস্তা ঘাটের শিশু ও দুস্থ অসহায় মানুষের প্রতি তার মানবতা ও সেবার কথা তিনি উল্লেখ করেন।
তিনি সেন্ট মাদার তেরেজা স্কুলের কথা বলতে গিয়ে বলেন স্কুল থেকে প্রতি বছর অনেক দয়ালু মানুষ বের হবে।
এরপর স্কুলে মাদার তেরেজার জীবনীসহ দুস্থ মানুষের সেবায় তার সেবাদানের অবদানের দিক তুলে ধরে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনা করে। এভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচী শেষ করা হয়॥

ঠাকুরগাঁও ধর্মপল্লীর বঠিনা গ্রামে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ প্রদান

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরগাঁও ধর্মপল্লীর বঠিনা গ্রামে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ প্রদান করা হয়। এতে চারটি গ্রাম থেকে আগত মোট ১১৮ জনকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ প্রদান করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ সেবাস্তিয়ান টুডু। তিনি বঠিনা গ্রামে পৌঁছলে তাকে দাঁসাই নাচ ও পা ধোঁয়ার মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হয়। পরে বিশপ মহোদয় মহাসমারোহে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তাকে সহযোগিতা করেন ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার প্রদীপ মারাণ্ডী, ফাদার লাজারুস সরেন এবং ফাদার আশীষ রুনিয়া॥

ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিত ঃ ১৯৬০ খ্রীঃ রেজি.নং-৮/১০-১০-১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ও ৪২/৩-১২-২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ
ফাদার লিউ জে. সালিভ্যান (সি.এস.সি) ভবন, ধরেন্ডা মিশন, ডাকঘর ঃ সাভার , জেলা ঃ ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৮৭৭-৫৮৬৭১, ০১৮৭৭-৭৫৮৬৮১
ই-মেইল: dcccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট: www.dcccul.com

৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় ধরেন্ডা মিশন মাঠ প্রাঙ্গণে ক্রেডিট ইউনিয়নের **"৩৫ তম (রেজিষ্ট্রেশনোত্তর) বার্ষিক সাধারণ সভা"** অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য'কে যথাসময়ে নিজ নিজ সদস্য বহি/সদস্য আইডি কার্ড ও বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ উপস্থিত থাকার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

উজ্জ্বল শিমন রোজারিও
প্রেসিডেন্ট, ব্যবস্থাপনা কমিটি
ডিসিসিসিইউএলটিডি

বিকাশ পলিনুস কোড়াইয়া
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
ডিসিসিসিইউএলটিডি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

১। সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্যের সমিতিতে শেয়ার বা সদস্য সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
২। সকাল ১০:০০ টার মধ্যে সভার উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করে সদস্যগণকে খাদ্য কুপন সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
৩। সকাল ১০:০০ টার মধ্যে রেজিষ্টিকৃত সদস্যদের মধ্যেই কেবলমাত্র কোরাম পূর্তি লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞ/২৮৯/২৩

জরুরী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় পর্যায়ে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "কারিতাস বাংলাদেশ"- এর **"বারাকা" SDDB** এবং আলোকিত শিশু প্রকল্পে নিম্নলিখিত পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ঝুঁকিপূর্ণ পথশিশু ও মাদকনির্ভরশীল শিশুদের সাথে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি ও সুস্থতাগামী আসক্ত (Recovering Addict) প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন।

ক্রম	পদের কর্মস্থল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি	অন্যান্য যোগ্যতা
১।	**পদের নাম:** সাইকোলজিস্ট/কাউন্সেলর (খন্ডকালীন) **পদের সংখ্যা :** ১ জন (পুরুষ/নারী) **বয়স :** ২৫-৩৫ বৎসর **বেতন/ভাতা :** সর্বসাকুল্যে মাসিক ৩০,০০০/- টাকা। **কর্ম এলাকা :** খিলগাঁও ও টঙ্গি সংলগ্ন এলাকা, ঢাকা। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** মাষ্টার্স ইন সাইকোলজী।	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূণ পথ শিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।
২	**পদের নাম : প্রজেক্ট এনিমেটর** **পদের সংখ্যা :** ১ জন (নারী /পুরুষ) **বয়স :** ২৫-৩৫ বৎসর **বেতন/ভাতা :** সর্বসাকুল্যে মাসিক ১৫,০০০/- টাকা। **কর্ম এলাকা :** বাবুবাজার/সংলগ্ন এলাকা, ঢাকা। **শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচ এস সি।**	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথশিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • সমাজের সকল শ্রেণীর (বিশেষভাবে): শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ও মাদকাসক্ত) সামাজিক নেতা, স্কুল শিক্ষক, বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার দক্ষতা, সাহস এবং মানসিকতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার পরিচালনায় (ওয়ার্ড ও এক্সেল) দক্ষতা থাকতে হবে। • সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।
৩	**পদের নাম :** কুক **পদের সংখ্যা :** ১ জন (পুরুষ) **বয়স :** ২৫-৪৫ বৎসর **বেতন/ভাতা :** সর্বসাকুল্যে মাসিক ১৫,০০০/- টাকা। **কর্ম এলাকা :** বাবুবাজার/সংলগ্ন এলাকা, ঢাকা। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** ৮ম শ্রেণী পাশ।	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথশিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • সংশ্লিষ্ট কর্ম এলাকায় অবস্থান করে কাজ করতে হবে। • সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে। • রাত্রিকালীন ডিউটি করা আবশ্যক হতে পারে।

১। জীবন বৃত্তান্তসহ দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার সহ ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীর নিজের মোবাইল নাম্বর সহ সাদা কাগজে নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবরে **আগামী ২৮-৯-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ** তারিখের এর মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পরিচালক, বারাকা বরাবর পাঠাতে হবে।
২। আবেদন পত্রের সাথে অবশ্যই (ক) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও মার্কশীটের সত্যায়িত কপি (খ) জাতীয় পরিচয়পত্র ও চারিত্রিক সনদ পত্রের সত্যায়িত কপি (গ) অভিজ্ঞতা সনদপত্রের সত্যায়িত কপি (ঘ) সদ্যতোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।
৩। চাকুরীতে নিয়োজিত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র তাদের আবেদনপত্রের সাথে সংযোজন করতে হবে।
৪। কোন প্রকার ব্যক্তিগত বা কারো মাধ্যমে যোগাযোগ/সুপারিশ প্রার্থীদের অযোগ্যতা বলে গণ্য করা হবে।
৫। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
৬। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে এবং প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদেরকে লিখিত পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে এবং এর জন্য কোন টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না; উক্ত প্রতিষ্ঠানে আবেদনে কোন প্রকার ব্যাংক ড্রাফট্ কিংবা জামানত প্রয়োজন নেই।
৭। ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে ।
৮। কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত, বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

পরিচালক, বারাকা, ৪৮২/১, ব্লক-এ, রোড-১১, তিলপাপাড়া, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯, ফোন: ০১৮১৮ ৪২ ১৫ ৪৩, Email: info@baracabd.org

বিজ্ঞ/২৯০/২৩

সবচেয়ে যে শেষে -এসেছিল
সে গিয়েছে সবার আগে সরে
ছোট যে জন ছিল রে সবচেয়ে
সে দিয়েছে সকল শূন্য ভরে।

দিয়া এ্যাঞ্জেলিনা রোজারিও
জন্ম: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
ধর্মপল্লী: দড়িপাড়া (মুলকার বাড়ী)

আদরের দিয়া মণি,

দিন রাতের আবর্তনে পৃথিবী তার আপন কক্ষ পথে অতিক্রম করেছে নিজ বার্ষিক গতি। তাই সময়ের পরিক্রমায় আজ একটি বছর হয়ে গেল তুমি পাড়ি জমিয়েছ তোমার চিরস্থায়ী ঠিকানা সেই চির বসন্তের দেশ অমরাবতীতে। আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি ও দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি তুমি পরম পিতার স্নেহার্দ বুকে শান্তিতে ও ভালোবাসায় সুখে আছ। পুরো বাড়ি জুড়ে ছড়িয়ে আছে তোমার স্মৃতি। তোমার দেয়া নামে পরিচিত হয়ে বেড়ে উঠছে তোমার স্নেহের ছোট ভাই দিয়ান। ওর অর্ধেকটা নাম জুড়েই তো তুমি। তোমার দাদু ঠাকুর হাসি-আনন্দ, হাসি ঠাট্টার খোরাক ছিলে তুমি, সেখানে কেমন যেন এক ভাটা পড়েছে। তোমার মা-বাবার কথা তো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। তোমাকে ছাড়া তাদের জীবন যেন শুষ্ক, তপ্ত, জলহীন মরুস্থল। তোমার প্রাণের পিসিমণি, পিসা ও মেইবেন ভাইয়ের জীবনের এক আমৃত্যু শূণ্যতা তুমি। তোমার ফাদার বড়বাবা, ব্রাদার কাকামণি ও সিস্টার ঠাকুর উৎসর্গকৃত জীবনের নানা প্রতিকূলতা, হতাশা, নিরাশার মুহূর্তে তোমার হাসি মাখা স্নিগ্ধ অকলুষ মুখ ছিল তাদের প্রাণের আরাম ও আশার আলোক বিচ্ছুরণ। আমাদের সবার এই নশ্বর জীবনে ক্ষণকালের একটুকরো স্বর্গ ছিলে তুমি। তুমিই আমাদের জীবনে ক্ষণিকের জন্য পাওয়া সেই স্বর্গীয় ফুল। তোমার পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, খেলা সাথী, সহপাঠী, প্রতিবেশি ও শুভাকাঙ্ক্ষী সবার প্রার্থনা ও স্মৃতিতে অক্ষয় তুমি।

তোমারই আপনজন,
দাদু ঠাকুমণি: প্রেমন ও রুপালী রোজারিও
বাবা মা: রোনাল্ড ও জেনিকা
ভাই: দিয়ান
ফাদার রিপন এসজে (বড়বাবা), ব্রাদার সনেট সিএসসি (কাকামণি), সিস্টার দিপালী সিআইসি (ঠাকু)
সাথী ও বাপ্পী (পিসি ও পিসা), মেইবেন (টুকু ভাই) ও অন্যান্য সবাই।

বিজ্ঞ/২৮৭/২৩

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে ড. ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা'র রচিত **"দাম্পত্য সুখের রসায়ন"** বই বের হয়েছে। যা নব দম্পতিদের সুখী ও খ্রিস্টীয় জীবন গড়তে সহায়তা করবে।

ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আজই আপনার পরিবারের জন্য এই বইটি সংগ্রহ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

মাদার তেরেজা ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
প্রতিবেশী প্রকাশনী বিক্রয় কেন্দ্র
লক্ষ্মীবাজার, তেজগাঁও, নাগরী, সিবিসিবি সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বিজ্ঞ/২৯১/২৩

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ৩৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 33
Regd. No. DA-33
❖ 17 - 23 September, 2023, ২ - ৮ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ফাতেমা রাণীর তীর্থে নিমন্ত্রণ

সম্মানিত সুধী,

সকলের প্রতি রইল বারমারী ফাতেমা রাণীর তীর্থস্থান থেকে খ্রীস্টিয় প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আসছে **২৬-২৭ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ; রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারমারী ধর্মপল্লীতে ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হবে** । এবছরের মূলসুর: **"সিনোডীয় মণ্ডলীতে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কর্মে ফতেমা রাণী মা মারীয়া"**।

আপনারা যারা পর্বকর্তা হতে, মিশার উদ্দেশ্য দিতে ও তীর্থস্থানের উন্নয়নের জন্য অনুদান দিতে আগ্রহী, তারা দয়া করে নিম্নে উল্লেখিত নাম্বারগুলোর মাধ্যমে যোগাযোগ করুন। **পর্বকর্তা সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা, মিশার উদ্দেশ্য সর্বনিম্ন ১৫০ টাকা।**

মা মারীয়ার আশীর্বাদ লাভে আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

খ্রীস্টেতে,
ফাদার তরুণ বনোয়ারী (সমন্বয়কারী)
বারমারী ফাতেমা রাণী তীর্থ কার্যকারী কমিটি
মোবাইল : ০১৯১৬-৪২৪৪৩৮ বিকাশ (ব্যক্তিগত);
ফাদার নরবার্ট গমেজ : ০১৬১৮-৩৪৩৬২৭ বিকাশ (ব্যক্তিগত)

অনুষ্ঠানসূচী

অক্টোবর ২৬, ২০২৩	অক্টোবর ২৭, ২০২৩
পাপস্বীকার ঃ ৩:০০ মি.	জীবন্ত ক্রুশের পথ ঃ ৮:০০ মি.
পবিত্র খ্রীস্টযাগ ঃ ৫:০০ মি.	মহাখ্রীস্টযাগ ঃ ১০:০০মি.
জপমালার আলোর শোভাযাত্রা ঃ ৮:০০ মি.	
সাক্রামেন্তের আরাধনা ও নিরাময় অনুষ্ঠান ঃ ১১:০০ মি.	
নিশি জাগরণ ঃ ১২:৩০ মি.	

বিজ্ঞ/২৮৬/২৩

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : **01798-513042,** E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org